বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

“কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৪ সংখ্যা } বৈশাখ ১৩০২—মে ১৮৯৫। { ৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

*	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আরম্ভ	শ	ম	শু	ম	শ	ম
	১৩	১৪	১৪	১৬	১৭	১৭
শেষ	৩১	৩১	৩২	৩২	৩১	৩০
	এ	মে	জুন	জু	আ	সে
আঃ	সো	বু	শ	সো	বৃ	বৃ
শেঃ	৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা

১৩০২ সাল।

ইং ১৮৯৫-৯৬।

সংবৎ১৯৫২-৫৩, শক১৮১৭।

ব্রাহ্মাব্দ ৬৬-৬৭।

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
বৃ	শ	র	সো	বু	শু
১৭	১৬	১৫	১৫	১২	১৩
৩০	২৯	২৯	২৯	৩০	৩০
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
ম	শু	র	বু	শ	র
৩১	৩০	৩১	৩১	২৯	৩১

† শ	†ম	শু	ম	শ	ম
র	বু	শ	বু	র	বু
সো	বৃ	র	বৃ	সো	বৃ
ম	শু	সো	শু	ম	শু
বু	শ	ম	শ	বু	শ
বৃ	র	বু	র	বৃ	র
শু	সো	বৃ	সো	শু	সো

১‡	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

বৃ	শ	র	সো	বৃ	শু
শু	র	সো	ম	শু	শ
শ	সো	ম	বু	শ	র
র	ম	বু	বৃ	র	সো
সো	বু	বৃ	শু	সো	ম
ম	বৃ	শু	শ	ম	বু
বু	শু	শ	র	বৃ	বৃ

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ	২৩	২১	১৯	১৭	১৪	১৩
পূঃ	২৬	২৫	২৩	২১	১৯	১৭
কৃঃ এঃ	৮	৭	৬	৩	১,৩১	২৮
অঃ	১২	১১	৯	৭	৪	২

শুঃ এ-শুক্লপক্ষ একাদশী, পূঃ-পূর্ণিমা।
কৃঃ এ-কৃষ্ণপক্ষ একাদশী, অঃ-অমাবস্যা।

* বৈ-বৈশাখ শনিবার, ১৩ই এপ্রেল, আরম্ভ, ৩১এ শেষ। জ্যৈ-জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, ১৪ইমে আরম্ভ, ৩১এ শেষ। এ-এপ্রেল সোমবারে আরম্ভ, ৩০এ শেষ ইত্যাদি।

† ১লা বৈ শনি, ২রা রবি, ৩রা সোম ইত্যাদি।

† ১লা জৈ মঙ্গল, ২রা বুধ, ৩রা বৃহস্পতি ইত্যাদি।

‡ বৈ শনি. জ্যৈ মঙ্গল, আষাঢ় শুক্র ১,৮,১৫,২২,২৯ তারিখে, ইত্যাদি।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃএঃ	১৩	১২	১৩	১৩	১৪	১৩
পূঃ	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭
কৃঃএঃ	২৮	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
অ	২	১	—	১	২	২

পরীক্ষা। ৮ই ও ১২ই বৈশাখের বার তিথি কি?

উ। ৮ই বৈ শনিবার ২০এপ্রেল কৃষ্ণ একাদশী। ১২ই বৈশাখ বুধবার ২৪ এপ্রেল অমাবস্যা।

নব বর্ষ।

প্রকৃতির নব ভাবের আবেশে,
নব বর্ষ পুনঃ আসিলে এ দেশে,
নবীন তপন সুনীল গগনে,
পূরিল জগৎ নবীন জীবনে,
নব পল্লবিত পাদপ সকল,
নব রাগে গায় বিহঙ্গম দল,
নবীন হিল্লোলে বহে সমীরণ,
নবোদ্যমে মত্ত জীব অগণন,
জীবন শকতি সৌন্দর্য্য চেতনা—
যাঁহ'তে হয়েছে সকলি কল্পনা,
নিত্য সত্য দেব চির-বর্ত্তমান,
দেখ সর্ব্ব-ভূতে তাঁর অধিষ্ঠান,
ছাড়ি ভূতভাবী ছাড়ি কর্ম্মভোগ,
বর্ত্তমানে তাঁরে কর সুখে ভোগ।

গত যে জীবন ফিরিবার নয়,
অনন্ত সাগরে হইয়াছে লয়,
তার দুঃখ সুখ তার কান্না হাসি,
ফুরায়ে গিয়াছে কাল স্রোতে ভাসি।
জাগায়ে সে সব স্মৃতিপটে আর,
বৃথা কালক্ষয়ে হবে কি সুসার ?
গতস্য শোচনা, বিফল ভাবনা ;
বর্ত্তমানে কর সাধ্যের সাধনা ;
আছে দেহ মন, কর প্রাণপণ—
"মন্ত্রের সাধন শরীর পাতন,
অশ্রুপাতে বীজ যে করে বপন,
সহাস্যে সে শস্য করে আহরণ।"
দেব-কৃপা সদা সাধকে সদয়,
বর্ত্তমানে তার লও পরিচয়।

ভবিষ্যে নির্ভর অদৃষ্টে দোহাই—
শিখ না এ নীতি কাপুরুষ ঠাঁই।
আজি যা হলো না, কালি কি তা হবে?
কে বলিতে পারে, কালি কোথা রবে?
ভবিষ্যৎ সদা হয় বর্ত্তমান,
বর্ত্তমান করে অতীতে প্রস্থান,
কত ভবিষ্যৎ ফুরায়ে গিয়াছে,
ভবিষ্যে বিশ্বাস করিতে কি আছে ?
আজিকার কাজ আজি শেষ কর,
কালিকার জন্য ভরসা ঈশ্বর।
বর্ত্তমান তব নিজস্ব সময়,
ভাবনা ভয়েতে করো না বিলয়।
যা হবার হবে, থাকিতে জীবন
স্বকার্য্য সাধনে সঁপ প্রাণমন।

পলকে পলকে জীবনের ক্ষয়,
নীরব প্রবাহে চলেছে সময়,
দেখিতে দেখিতে নব বর্ষবরে
দেখিবে ডুবিল কালের সাগরে।
ইষ্ট নাম লয়ে হও সচেতন,
বসিয়া স্বস্থানে স্বকার্য্য সাধন,
পলকে পলকে পুণ্যের সঞ্চয়,
পলকে পলকে কর পাপ জয়,
ভূতের ভাবনা ভবিষ্য কল্পনা,
ছাড়ি কর নিত্য কঠোর সাধনা,
চির-বর্ত্তমান দেবতা সহায়,
অসাধ্যও সাধ্য তাঁহার কৃপায়।
নিত্য নবোদ্যমে করি তাঁতে ভর,
জীবনের পথে হও অগ্রসর।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

উষ্ণতম স্থান—পৃথিবীর মধ্যে মাসোয়া নামক স্থান উষ্ণতম। মরুভূমি হইতে উষ্ণবায়ু বহিতে থাকিলে এখানে তাপমান যন্ত্রের পারদ ১৬০ ডিগ্রী উঠিয়া থাকে।

বঙ্গবালার বিলাত গমন—হায়দ্রাবাদের নিজাম ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বার্ষিক ৩০০ পাউণ্ড বৃত্তি দিয়াছেন। কুমারী ঐ বৃত্তি লইয়া বিলাতে গিয়া শিক্ষালাভ করিবেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা—এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ ২৭৪৩টী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৫৪১ প্রথম, ১২০৮ দ্বিতীয়, এবং ৯৯৪ জন তৃতীয় বিভাগস্থ। যে সকল বালিকা পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়াছে, তাহাদের বিশেষ বিবরণ এই:—

বালিকার নাম	বিভাগ	স্কুল
স্নেহলতা মজুমদার	১ম	বেথুন
মার্টিন এল্‌সী হার্ট	ঐ	লামার্টিনিয়ার
লিলিয়ান পালিত	ঐ	লোরেটো
ডি সিলভিয়া	ঐ	ঐ
খোরাব কেটী	ঐ	ঐ
আর্ডেন এলিস	ঐ	ঐ
কামেল কেটী	ঐ	ঐ
কিসার জেন	ঐ	ঐ
বিএট্রিস মেরী স্মিথ	ঐ	মিস ওব্রায়েন্স
হেনরিয়েটা ওয়াকি	ঐ	কলিকাতা গার্লস
আলিস রাইট	ঐ	প্রাইবেট
সি এম করিয়া	ঐ	ঐ
আরাটুন লিলী	২য়	লোরেটো
সিনক্লেয়ার ফ্লোরী	ঐ	ঐ
সরোজিনী ঘোষ	১ম	ক্রাইষ্ট চর্চ্চ
ডি সণ্টি	ঐ	ডবটন
ডি সোজা যোজেফাইন	ঐ	কলিকাতা গার্লস্
সুপ্রভা গুপ্ত	২য়	বেথুন
ডি, চন্দ্র	ঐ	ঐ
গালষ্টন রোজিনা	ঐ	ঐ
ডি সোজা লিলী	ঐ	রেঙ্গুণ কন্‌বেন্ট
কে, টি, মির্জা	ঐ	দার্জিলিং সেণ্টপল
সরোজিনী ঘোষ	ঐ	ব্রাহ্মবালিকা
পেসেন্স এজ	৩য়	মেথডিষ্ট রেঙ্গুণ
সৌদামিনী বন্দো।	ঐ	ব্রাহ্ম বালিকা
হেমকুসুম গুপ্ত	ঐ	প্রাইবেট
ওয়াইলী লাবেনিয়া	ঐ	লেডী ডফারিণ

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যলয়—এ বৎসর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবে কয়েকটী দেশীয় মহিলা উপাধি প্রাপ্ত হন, তদ্দর্শনে প্রায় ৪০টী হিন্দুমহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। মান্দ্রাজে ইহা নূতন ঘটনা।

শিশু বিবাহ—বঙ্গদেশে শিশু-বিবাহ কুপ্রথা কতদূর প্রবল রহিয়াছে, তাহা গত (সেন্সস্) লোকসংখ্যা গণনা তালিকা দেখিলেই সপ্রমাণ হয়। ৪বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বিবাহিত বালিকার সংখ্যা ৩০,৩৩২, বালকের সংখ্যা ৬৭৮০ এবং ৪ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বিধবার সংখ্যা ৬৭৮০টী। ইহাতে বোধ হয় প্রায় ২৪ হাজার দুগ্ধপোষ্য মেয়ে বয়স্ক-ব্যক্তিদিগের সহিত বিবাহিতা, তন্মধ্যে বৃদ্ধও থাকিতে পারে। ৯ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালিকা ৩,৭৮,৭৫৪ বিবাহিতা এবং ১২,৯৯৪ বিধবা।

হানিমান্ উৎসব—বিশ্বহিতৈষী

হাম্মিান্ ১৩১ বৎসর হইল মানবলীলা সংবরণ করেন। এ বৎসর ভারতবিজ্ঞান সভাগৃহে তাঁহার উৎসব হইয়া গিয়াছে।

কন্যাশ্রম—জলন্দরে আর্য্যবালিকাদিগের বাসের জন্য একটী বোর্ডিং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। আর্য্যসমাজের সভ্যগণ এই শুভানুষ্ঠান করিয়াছেন ইহা আরও আনন্দের কথা।

কন্যা বিক্রয়—চীনেরা কন্যা বিক্রয় করিয়া থাকে। মেয়ের দর ক্রমে বাড়িতেছে। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে ৫০ টাকা ছিল, এক্ষণে ৫০০।১০০০ টাকা হইয়াছে। বঙ্গদেশে ঘরের টাকা দিয়াও মেয়ে বিকায় না। বরের দর শূন্য স্থানে ৫০০০ টাকা হইয়াছে।

নি-মেয়ে দেশ—রুষের অধীনস্থ মেমাচীন নগরে কেবল পুরুষ বাস করে, একটীও স্ত্রীলোক নাই।

মাতৃ-হৃদয়।

১

সন্ন্যাসী ঠাকুর সেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেখানে দীন হীন অনাথ আতুরদিগকে সেবা করা হয়। শুনিলাম যে সংসারবন্ধন-শূন্যা, সবলা, সুস্থকায়া রমণী যদি তাঁহার সহকারিণী হইতে চাহে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে সে পুণ্যাশ্রমের সেবিকা করিতে পারেন।

আমি একজন "সংসারবন্ধন-শূন্যা, সবলা সুস্থকায়া" রমণী।* সন্ন্যাসী ঠাকুর শ্রীযুক্ত যোগনারায়ণ বাবাজী মহাশয়ের কাছে অনেক দিন হইতে পরিচিতা; শুধু পরিচিতা নহি, তাঁহার কাছে আমি কন্যার ন্যায় স্নেহাস্পদা। তাই আমি তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম "ঠাকুর! আমাকে আপনার সেবালয়ে রাখুন; আমার যথাসাধ্য আমি সেবালয়ের কার্য্য করিব।"

প্রতিভা-বিস্ফারিত, বিশস্ত ও পবিত্র দৃষ্টিপূর্ণ চক্ষু দুইটী তুলিয়া সন্ন্যাসী আমার মুখের প্রতি চাহিলেন, তার পরে বলিলেন "এখন সেবালয়ে থাকিয়া তোমার কাজ নাই মা।"

লজ্জায় আমার মুখ শুকাইয়া গেল। আমার কপোল রাঙা হইয়া উঠিল। শেষে আপনাকে সামলাইয়া সবিনয়ে বলিলাম "আমার অপরাধ কি ঠাকুর?"

স্নেহার্দ্রস্বরে সন্ন্যাসী বলিলেন "তোমার অপরাধ নহে মা, তুমি শিশুর মত পবিত্রা, বীরের মত সাহসিনী।

"কিন্তু সেবালয়ের সেবিকা হইতে হইলে পবিত্রতা, সাহস সঙ্গে আরও একটী জিনিস চাই; যদি সে জিনিস ভগবান্ তোমাকে কোনও দিন দেন,

* 'আমি' অবশ্য বামাবোধিনীর 'আমি' নহে।

তবে সে দিনে আমি তোমাকে সাধিয়া ডাকিয়া আনিব। এখন তুমি ঘরে যাও মা।"

এ প্রহেলিকার অর্থ বুঝিতে পারা আমার সাধ্য নহে। আমি অতীব কৌতূহলাক্রান্তা হইয়াছিলাম, তাই আবার জিজ্ঞাসা করিলাম "সে জিনিস টা কি, ঠাকুর?"

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন "যখন ভগবানের ইচ্ছা ইহবে, তখনই জানিতে পারিবে।"

ইহার পরে ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আর বাদানুবাদ নিষ্ফল। আমি ভক্তি-ভাবে গলায় কাপড় দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম; তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিলাম।

আমি সত্য কথা বলিব; আমার অভিমানের মাত্রা একটু বেশী। তাহাতে ঠাকুর মহাশয় আমার পিতৃতুল্য ভক্তি-ভাজন। সুতরাং আমার মনে মনে কেমন একটু রাগ হইল। যেখানে ভালবাসা, অভিমান সেখানে তো আসেই। আমি তাঁহার কাছে কিছু দিন গীতা, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি শুনিতে যাইব না, স্থির করিলাম।

২

আমার ঘুম ভাঙিয়াছে মাত্র—এখন উষার প্রথম হাসি জগৎ-বক্ষ আলো করিতেছে, নব-জাগরিত বিহঙ্গ মধুর কাকলী ছড়াইতেছে, নবস্ফুট চ্যুত মুকুলের সৌরভ বহিয়া সমীরণ পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করিতেছে; এমন সময়ে আমার পর্ণ-কুটীরের দুয়ারে নবজাত শিশুর রোদন ধ্বনি শ্রুত হইল। আমার প্রাণ কেমন চম্‌কিয়া উঠিল—আজি বারো বছর আমি স্বদেশ ছাড়িয়া তীর্থবাসিনী হইয়াছি, বাছিয়া বাছিয়া নির্জ্জন স্থানে কুটীর বাঁধিয়াছি, আমার বাড়ীর কাছে দুই এক ঘর নীচ জাতি যাহারা আছে, তাহাদের ঘরে শিশুও নাই, সহসা জন্মিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, তবে এত ভোরে এখানে কচি ছেলের কান্না শুনিলাম কেন? যাহাহউক ভগবানের নাম করিতে করিতে চক্ষু মুছিলাম; তার পরে তৃণশয্যা ছাড়িয়া, উৎসুক চিত্তে ঘরের দরজা খুলিলাম।

দরজা খুলিয়া দেখি, গোলাপ ফুলের আধ ফুটন্ত কুঁড়িটির মত একটী শিশু এক টুকরা কাঁথার উপরে শুইয়া কাঁদিতেছে। বিস্মিতা হইয়া যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর চারি পাশে চাহিয়া দেখিলাম, কোথাও মনুষ্য সমাগম দেখিতে পাইলাম না! কেবল আমার কুটীর বেষ্টন করিয়া সেই সব তরু লতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; উপরে নীল আকাশ—নিস্তব্ধ নীল আকাশ স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে; আর উষার শিশিরস্নাত ভূতলের উপরে, বিশ্বজগতের করুণা-ভিখারী হইয়াই যেন এই অসহায় শিশু করুণকণ্ঠে কান্না ধরিয়াছে। আঃ সর্ব্বনাশ! একি? এতটুকু ছেলে এখানে রাখিয়া গেল কে? আবার আমি চারি পাশে শিশুর মা'কে খুঁজিতে লাগিলাম।

কিন্তু তাহার "মা" কেহ মিলিল না। "আমারই" বলিয়া সেই অনাথ, অশরণের প্রতি কেহই দাবী করিতে আসিল না! এখন আমি করি কি? উপযুক্ত যত্নের অভাবে শিশুটী এখনই মারা যাইবে—ভগবানের কাছে আমারই জবাব-দিহি করিতে হইবে। ভাবিলাম, ঠাকুর মহাশয়ের সেবালয়ে দিয়া আসি, তিনি অবশ্য একটা সদুপায় করিবেন। আমার সাত জন্মে বোধ হয় সন্তান হয় নাই—পরের ছেলে মানুষ করিতে আমার ক্ষমতা নাই।

ছেলেটীকে নিয়া সেবালয়ে যাইব, ভাবিয়া তাহাকে কোলে তুলিতে গেলাম। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া ঘুমিয়া পড়িয়াছিল,—এখন আবার ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাত গায়ে লাগিয়াই, রাঙা রাঙা ঠোঁট দুখানি ফুলাইয়া কাঁদিতে লাগিল! মরি! মরি! কি সুন্দর মুখ! কি মনোহর ছবি! জগতের অপবিত্র বাতাস গায়ে লাগে নাই বলিয়া শিশুরা বুঝি এতই সুন্দর!

সেই অনাথ পরের ছেলেকে কোলে করিয়া আমার কি হইল কে জানে? আমার প্রাণের প্রাণে যেন কি এক বৈদ্যুতিক ছুটিল! আমি এত দিন স্নেহ মমতার সহিত সম্পর্কে বঞ্চিতা ছিলাম; ফল্গু নদীর উপরে যেমন বালির জমাট পড়িয়া থাকে, আমার হৃদয়েও স্নেহ মমতার উপরে সেই রকম বিরক্তি ও উদাসীনতার জমাট পড়িয়াছিল, আজি যেন সেই আবরণ সরিয়া গিয়া সহস্র মুখে দিগন্তপ্লাবী স্রোত ছুটিল! আমার কপালে যাহাই হউক, এ শিশুকে আমি কখনই পরের হাতে দিতে পারিব না; আমার মনে হইতেছে, পরে ইহার মূল্য বুঝিবে না! এই স্বর্গীয় ফুল অনাদরে অবহেলায় শুকাইয়া যাইবে, প্রাণে তাহা কখনই সহিবে না! ভগবান্ যখন ইহাকে আমার হাতে দিয়াছেন, তখন যথাসাধ্য আমিই ইহাকে মানুষ করিব।

আমার গত জীবনের ইতিহাস এই-খানে একটু বলা আবশ্যক। আমার মাতা পিতার কথা আমার মনে পড়ে না। শুনিয়াছি আমার বয়স তিন বৎসর পূর্ণ না হইতেই তাঁরা ইহ জগৎ ছাড়িয়া-ছেন। তদবধি আমি পরের হাতে গঠিত হইয়াছি; তাও পাঁচ জনের "কর্ত্তব্য জ্ঞান" আমাকে রক্ষা করিয়াছে—কোনও ব্যক্তি অলৌকিক স্নেহপূর্ণ হৃদয় লইয়া আমায় পালন করে নাই। আমার অনাথ নিরাশ্রয় হৃদয়ও "জগতের অব-লম্বন" বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে জড়াইয়া ধরে নাই। তার পরে আট বছর বয়সে, আমার জেঠা খুড়াদিগের ইচ্ছানুসারে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল, কিন্তু আমার "জোর কপাল" বলিয়া সে বাঁধনও বেশি দিন টিঁকে নাই—দশবছর বয়স না হইতেই আমি সিঁথীর সিঁদুর মুছিবার এবং চুড়ী কয় গাছি খুলিবার অধিকারিণী হইলাম।

বিধবা হইতে স্ত্রীলোকে ভয়ে মরিয়া যায় কেন, তাহা ভগবানই জানেন, আমিতো শ্বশুরশ্বাশুড়ীহীন, যাতা ও ননন্দাদিগের নিষ্ঠুর শাসনপূর্ণ শ্বশুর বাড়ী রূপ "কারাগারে" আর যাইতে হইবে না ভাবিয়া বেশ একটু পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম।

কিন্তু সে "সুখ"ও আমার অদৃষ্টে ভোগ হইল না। স্বামীর কাছে বঙ্গ-মহিলারা নাকি স্নেহ, প্রীতি, আদর, সম্মান, যত্ন, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি পাইয়া থাকে; কিন্তু সে সব পাইবার আগে তো তাঁহাতে আমাতে" স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যবধান" হইয়া গেল। পাইবার মধ্যে পাইলাম কেবল দুই জিনিস; এক ব্রহ্মচর্য্য, আর স্বামীর ত্যাজ্য বিষয় সম্পত্তি। ব্রহ্মচর্য্যের উপরে কেহ অবশ্য "সতৃষ্ণ" দৃষ্টি করিল না। কিন্তু বিষয় সম্পত্তির উপরে অনেক পিপাসিত চক্ষু পড়িল। অধিক কি, নিরীহ মেষকে সম্মুখে পাইলে, ক্ষুধিত শার্দ্দূলদলের যে অবস্থা হয়, আমাকে বিষয়সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে দেখিয়া আমার পিতৃকুলের ও পতিকুলের আত্মীয়দিগেরও সেই রকম অবস্থা হইল! মোকর্দ্দমা মামলা প্রভৃতি উপস্থিত হইল। শেষে পতিকুলের আত্মীয়েরা প্রবল পক্ষ বলিয়া তাঁহাদেরই জয় হইল। আমাকে তাঁহাদের আশ্রয়ই গ্রহণ করিতে হইল।

সে গৃহে গিয়া, স্নেহ মমতা ভিন্ন আর সবই আমি পাইলাম। আমিও ভাল বাসা ভিন্ন আর সবই তাঁহাদিগকে দিলাম। এই রকমে প্রায় পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গেল। এই পঁচিশ বৎসর আমি সংসারাশ্রমে বাস করিলাম সত্য, কিন্তু পদ্মপত্রের বারিবিন্দুবৎ সম্পূর্ণরূপেই আমি নির্লিপ্তা। কাহারও দুঃখে আমার হৃদয় ভাল করিয়া ভিজে নাই; কাহারও সুখ আমি আমার নিজের সুখ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই; তাই আমি এক ঘর লোকের সহিত বাস করিয়াও প্রকৃতপক্ষে একা ছিলাম।

কিন্তু এ রকম ঘরকন্না আমার ভাল লাগিত না। কাহার জন্য নানান্যরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতেও আমার বড় বিরক্তি জন্মিত। মানুষে নিজে কষ্ট পাইয়া পরকে সুখী করিতে চাহে কি করিয়া? অথচ এই সকল প্রীতিশূন্য বন্ধুদিগের জন্য আমাকে খাটিয়া বেড়াইতে হইবে! তাই সকল গোলমাল হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আমি তীর্থবাসিনী হইতে প্রস্তুত হইলাম। জ্ঞাতি বন্ধুদিগকে বিষয় আশয় লিখিয়া দিয়া আসিলাম, সুতরাং তাঁহারা কেহই আমার সংসার ত্যাগের জন্য দুঃখিত হইলেন না। বিষয় সম্পত্তি তাঁহাদেরই রহিল; তবে আমার জীবন যতদিন থাকিবে, ততদিন তাঁহারা আমার ভরণ-পোষণের জন্য, আমাকে মাসে মাসে কিছু কিছু টাকা পাঠাইয়া দিবেন, এই মর্ম্মে লেখা পড়া হইল। টাকা কড়ির বিষয়ে অনাথা বিধবাকে (আত্মীয়দিগের)

ফাঁকি দিবার প্রথাটা এ দেশে ধৃতরাষ্ট্রের সময় হইতে প্রচলিত থাকিলেও আত্মীয়েরা আজিও আমাকে ফাঁকি দেন নাই। তাঁহারা সত্য সত্যই আমাকে মনে করিয়া মাসে মাসে "কিছু কিছু" দিয়া থাকেন, তাহাতেই আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

"জীবিকা নির্ব্বাহ" হয় সত্য, সে আমার নিজেরই। আর এক জনের ভরণপোষণ হয়, এমন কিছুই আমার সংস্থান নাই—তা না থাকুক, আমি নিজে না হয় একটু ক্লেশ পাইব; তা এ খোকাকে ছাড়িতে পারিব না; নিজে আধপেটা খাইয়াও যদি ইহাকে বাঁচাইতে পারি, তাহার অপেক্ষা সুখ আমার আর কিসে? আমার স্বার্থপর হৃদয়ে, আমার অজ্ঞাতে, এই প্রথম পরার্থপরতা জাগিল!

আমি ছেলে "মানুষ" করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। টিপুর মা গয়লানী আগাম টাকা পাইয়া, তাহার কপিলা গাভীর খাঁটি দুধ দিতে প্রতিশ্রুত হইল। আমি দুধে জল মিশাইয়া, পল্‌তে করিয়া খোকাকে খাওয়াইতে লাগিলাম। আমার ব্যবহারের জন্য ছেঁড়া কাপড় রাখিয়া, ভাল কাপড় গুলি দিয়া খোকার জন্য জামা, কাঁথা, বালিস, লেপ, তোষক, প্রভৃতি সেলাই করিয়া ফেলিয়াছি! রাত্রিতে খোকা ঘুমাইলে আমি সারা রাত্রি আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকি; আমার তো পর্ণকুটীর, পাছে আমি ঘুমাইয়া পড়িলে আমার "যাদুমণি"কে বিছা, পিপীড়া প্রভৃতি বিষাক্ত জীবে কাম্‌ড়ায়!

দিনের পর, দিন যায়। এমনি করিয়া যখন ছয় মাস কাটিল, তখন খোকা বাঁচিবে বলিয়া আমার ভরসা হইল। সত্য কথা বলিতে কি, আমার জীবন এতদিন যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট ছিল, এখন এই জড় চেতনের মধ্যবর্ত্তী পরের ছেলেকে পাইয়াই লক্ষ্য প্রাপ্ত হইল। মানুষের প্রাণে প্রেমের বন্ধন না থাকিলে, সে প্রাণ কিরূপে থাকে? আমি এত দিন কি করিয়া বাঁচিয়া ছিলাম? আজি খোকাকে পাইয়াই আমি গৃহ পাইলাম, সংসার পাইলাম, সমাজ পাইলাম; মনে মনে ভগবানের সত্য মূর্ত্তি অনুভব করিতেও পারিলাম। খোকার মঙ্গলের জন্য ভগবান্‌কে ডাকিতে ডাকিতে—বলিলে লোকে "পাগল" ভাবিবে কি?—আমার মনে হয় আমি যেন ক্রমশঃ ভগবানের দিকে উঠিতে পারিতেছি! খোকা আমার সর্ব্বস্বধন!

ক্রমে আমার সর্ব্বস্বধন হাঁটিতে শিখিল; তারপরে তার মুখে আধ আধ কথা ফুটিল। এ জগতে মানুষের যে সব আকাঙ্ক্ষিত জিনিস—ধন, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সবই একদিকে, আর আমার খোকার অমৃত বিজড়িত, আধ আধ কথায় "মা" "মা" বলিয়া ডাকা, আর একদিকে! আগে যাহা বলিলাম, সে সবই মর জগতের জিনিস; সে সব জিনিস ভোগ করিতে গিয়া দুই দিনেই

মন পরিতৃপ্ত হইয়া যায়; তখন আবার সুখের জন্য অন্য কোন নূতন বন্দোবস্ত করিতে হয়! কিন্তু শেষে যাহা বলিলাম, তাহাই স্বর্গের অমৃত! তাহার ভোগ আছে, পরিতৃপ্তি নাই; আনন্দ আছে, আশঙ্কা নাই; আকাঙ্ক্ষা আছে, সীমা নাই! খোকা আধ আধ কথায় আমার প্রাণে অমৃত ঢালিয়া দিল; আমার সঙ্গে সে কত কথাই কহিল—পাখীকে বলিল "যাতী," ঘটিকে বলিল "ততী," গরুকে বলিল "গলু," প্রতিবাসিনী স্বর্ণকে বলিল "দোনো"। সুতরাং হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাহার সোনা মুখে চুমো খাইয়া খাইয়া আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম।

এখন খোকার একটী নাম রাখা দরকার। আমি বাবাজীর কাছে বিষ্ণুপুরাণ পড়িতে শিখিয়া ছিলাম—খোকাকে পাইয়া লেখা পড়া করিবার প্রবৃত্তি বা অবকাশ বড় ছিল না, তথাপি আজি একবার "বিষ্ণুপুরাণ" মনে পড়িল। বিষ্ণুপুরাণের সুনীতি রাণী বিজন বনে পাতার কুটীরে একটী মোটা সোটা ননীর পুতুলের মত, রাঙা টুকটুকে খোকা লইয়া বাস করিতেন—সেই কথা আমার ধাঁ করিয়া মনে পড়িল। তখন খোকার নাম রাখিতে আর বিলম্ব হইল না—আমার অমূল্য ধনের নাম রাখিলাম "ধ্রুব"। নামকরণের দিনে আমি শত সহস্রবার খোকাকে "ধ্রুব" বলিয়া ডাকিলাম। খোকাও শত সহস্রবার আমার ডাকে ডাক শুনিল। শেষে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম "সে ধ্রুব তার মা'কে যেমন হরি এনে দিয়েছিল, তুই ধ্রুব তোর মা'কে তেমনি হরি এনে দিতে পার্‌বি?" ধ্রুব তাহার নীলোৎপলের মত চক্ষু দুইটী আমার মুখের উপরে রাখিয়া অনায়াসে, অভ্যস্তের মত সহজে বলিল "হলি দিনে পাওবো।" ধ্রুব তো কচি ছেলে, প্রতিধ্বনির মত কথা কয়; কিন্তু আমার বুক চম্‌কিল কেন? চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু আসিলইবা কেন?

(ক্রমশঃ)

আর্ম্মেণীয় রমণীর বীরত্ব।

আর্ম্মেণীয়া বর্ত্তমান তুরস্ক রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রদেশ। এ স্থানের অধিবাসিগণ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ও রোমান ক্যাথালিক সম্প্রদায়ভুক্ত। এই প্রজামণ্ডলীর উপর এক নূতন কর নির্দ্ধারিত হইলে, তাহা আদায় করিবার জন্য রাজকর্ম্মচারিগণ আর্ম্মেণীয়াতে গমন করেন। করভারে-প্রপীড়িত আর্ম্মেণীয়গণ আর অতিরিক্ত কর দিতে অশক্ত বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করে। সুলতান-কর্ম্মচারিগণ তাহাদের আপত্তি গ্রাহ্য করেন না, তাহারা বলপূর্ব্বক কর আদায় করিতে আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে রাজসৈন্যগণের সহিত প্রজাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধও

হইয়াছে। তুর্কিসৈন্য কর্ত্তৃক আর্ম্মেনীয়গণ ভয়ঙ্কর উৎপীড়িত হইয়াছে। এই অত্যাচারের সংবাদ ইউরোপের প্রবল শক্তিসম্পন্ন খৃষ্টান রাজদিগের শ্রুতিগোচর হইলে, তাঁহারা এক কমিশন স্থাপন করিয়া সংবাদপত্রে লিখিত অত্যাচারকাহিনীর সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ইংলণ্ডের মহামতি গ্লাডষ্টোন সাহেবও এজন্য আর্ম্মেণীয়াতে আগমন করিয়াছিলেন।

এই সমবেত অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইতেছে যে, যথার্থ ই আর্ম্মেণীয়ার খৃষ্টান প্রজাদিগের প্রতি তুর্কি কর্ম্মচারিগণ অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে। তাহারা ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা প্রদান করিয়া বহু নরনারীকে হত্যা করিয়াছে। সে সকল রোমহর্ষণ অত্যাচারকাহিনী পাঠ করিলে রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু অপর দিকে আর্ম্মেণী পুরুষ ও রমণীগণ চিতোর যোদ্ধৃগণের ন্যায় সম্মান ও আত্মরক্ষার জন্য লোকাতীত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই প্রজা ও রাজা, দুর্ব্বল ও সবল, শিক্ষিত সেনা এবং অশিক্ষিত অস্ত্রহীন পল্লীবাসিগণের মধ্যে যে ভয়ানক সংঘর্ষ হইয়াছিল, তাহার একটী উপাখ্যান লিখিত হইতেছে।

তুর্কিগণ, আর্ম্মেণীয়দিগের আওক নামক স্থান অবরোধ করিয়াছে। বহু পুরুষ ও রমণী প্রাণভয়ে নগর পরিত্যাগ করিয়াছে। গ্রেগো নামক এক জন সাহসী বীরপুরুষ প্রাণপণে নগর রক্ষা করিতেছিলেন। তিনি প্রস্তর ও তরবারীর সাহায্যে ক্রমাগত ছয় দিবস নগরটী রক্ষা করেন। কিন্তু প্রবল তুর্কিসৈন্যদিগের অস্ত্রাঘাতে আর্ম্মেণীয়গণ ক্রমে নিঃশেষিত হইতে লাগিল। পুরুষদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া অবশেষে রমণীগণ অসমসাহসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

গ্রে গো গত ২৩শে আগষ্ট খাদ্য দ্রব্যাদি, যুদ্ধোপকরণ এবং সৈন্য ও অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য স্থানান্তরে গমন করেন। তৎপর দিবস (২৩শে আগষ্ট) প্রাতঃকালে রমণীগণ প্রবল উৎসাহে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিবারাত্রি ভয়ানক যুদ্ধে অতিবাহিত হইল। অনাহার ও অনিদ্রাজনিত ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া কোমলাঙ্গী রমণীগণ দুর্দ্ধর্ষ তুর্কিসৈন্যদিগের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুশিক্ষিত মুসলমান সৈন্যের গতিরোধ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। মুসলমান সৈন্যগণ রমণীদিগের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তথন রমণীগণের কি ভয়ানক অবস্থা! সন্তানবতী নারীগণ স্বীয় স্বীয় শিশুসন্তানদিগকে পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া শত্রুপক্ষের গতি রোধ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। বয়স্ক পুত্র কন্যাগণ মাতাদিগের সম্মুখে রুধিরাপ্লুত দেহে দণ্ডায়মান। যুদ্ধের ভীষণ পরিণাম চিন্তা করিয়া রমণীগণ প্রস্থান করি-

ধার সংকল্প করিল। কিন্তু চারিদিকে শত্রুগণ প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান থাকায় তাহারা কোনও ক্রমেই পলায়ন করিতে সমর্থ হইল না। এই ঘোর সঙ্কটকালে গ্রেগোর পত্নী সোহাখী এক পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ভগিনীগণ! এখন আসন্ন কাল উপস্থিত! দুইটী পথ তোমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, এই দুইয়ের এক পথ তোমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম পথ এই, তোমাদিগকে তুর্কিদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে; তোমাদের স্বামী, জন্মভূমি এবং ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ ও সতীত্ব বিনাশ করিতে হইবে। আর এক পথ আছে, সেই পথে আমি যাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি এক বৎসর বয়স্ক একটী শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া পর্ব্বত শীর্ষ স্থান হইতে গহ্বরে পতিত হইলেন! মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার দেহ চূর্ণীকৃত হইয়া গেল। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া অনলে পতঙ্গপতনের ন্যায় বহুসংখ্যক রমণী সেই পর্ব্বতগহ্বরে ঝম্প প্রদান করিলেন। তাহাদের সন্তানগণ মেষশাবকের ন্যায় মাতৃগণের অনুগমন করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই মানবদেহে বিস্তৃত গহ্বরে পূর্ণ হইয়া গেল। সর্ব্ব শেষে যে রমণী ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন, শবরাশি পূর্ণ গর্ত্তে পতিত হওয়াতে তাঁহার শরীরে কোনও আঘাত লাগিল না।

তুর্কিসৈন্য ইতিমধ্যে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া জীবিত পঞ্চাশ জন স্ত্রী ও এক শত শিশু সন্তানকে বন্দী করিয়া তাহাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা অসহ্য যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়াও তাহাদের অধিনায়ক গ্রেগোর দলবল কোথায় গিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিল না।

এই আর্ম্মেণীয় খৃষ্টান নরনারীদিগের আদিম বৃত্তান্ত যিনি অনুসন্ধান করিবেন, তিনিই এই মীমাংসায় উপনীত হইবেন যে, ইহাঁদের মধ্যে বহুলোক হিন্দু-শোণিত-সম্ভূত। বহু দিন পূর্ব্বে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দু ছিলেন। তাহার ইতিহাস এই, খৃষ্টাব্দের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাণিজ্যাদি করিবার জন্য এক দল হিন্দু বণিক্ আর্ম্মেণীয়াতে গিয়া বাস করে। হিন্দুগণ কর্ত্তৃক সেখানে তিনটী নগর স্থাপিত হয়। ইহাদ্বারাই অনুমিত হয় যে তাহারা সেখানে কিরূপ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহারা বহু অর্থ ব্যয়ে তত্রত্য কেশী নামক পর্ব্বতোপরি দুইটী দেবমন্দির নির্ম্মাণ করে। অকস্মাৎ এই উন্নতিস্রোতের দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল। খৃষ্টের চারিশত বৎসর পরে সেণ্ট গ্রেগরি নামক বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক আর্ম্মেণীয়াতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করেন। তিনি তথাকার খৃষ্টান রাজাদিগকে এই "পৌত্তলিক অনন্ত নরকবাসীদিগের" প্রতিকূলে উত্তেজিত করেন। যখন হিন্দুগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ

করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। "যে তোমার দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করে, তাহাকে বামগণ্ড ফিরাইয়া দেও।" এই মহামূল্য স্বর্গীয় উপদেশ যে নর-দেবতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, তাঁহার কথিত ধর্ম্ম শোণিত বিনিময়ে প্রচারিত হইতে লাগিল। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক হত হিন্দুদিগের দেহ গর্ত্তে পুতিয়া তদুপরি একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। আর্ম্মেণীয়ার তৎকালীন ইতিহাসলেখক জেনোবিয়াসের ইতিহাসে এই যুদ্ধের সবিস্তর বিবরণ লিখিত আছে। তিনি নিজে এই যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে হিন্দু মৃত ১০৩৮ জন। অবশিষ্ট হিন্দু বন্দী হয় এবং তাহাদের ধনরত্নাদি সমুদয় খৃষ্টানগণ আত্মসাৎ করেন। দেবমন্দিরের পুরোহিতগণ খৃষ্টানদিগের চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, দেব মন্দির ও প্রতিমা যেন ভগ্ন করা না হয়। প্রচারোম্মত্ত খৃষ্টানগণ তাহা শুনিল না। সুতরাং পুরোহিতগণ যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিল। খৃষ্টানগণ দুই জন পুরোহিতকে তৎক্ষণাৎ তরবারীর আঘাতে বিনষ্ট করিলে চারিশত পুরোহিত ও রমণীকে খৃষ্টান করিবার জন্য বন্দী করা হইল। তাহারা খৃষ্টান হইতে অস্বীকৃত হওয়ায় স্বয়ং গ্রেগরি বিচার করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন। টৈফটকরণ নগরে এই চারিশত পুরুষ ও রমণীকে কাটিয়া ফেলা হয়। অবশেষে ৫০৫০ হিন্দু পুরুষ ও রমণীকে ১লা আগষ্ট তারিখে একবারে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়।* যাহারা ইহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আসিয়াটিক সোসাইটির ১৮৩৬ সালের জুন সংখ্যার পত্রিকা দেখিবেন।

অতএব ইহা নিশ্চয় যে, বর্ত্তমান সময়ে তুর্কি সুলতানের অত্যাচারী কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক আর্ম্মেণীয়াতে যে সকল খৃষ্টান নরনারী উৎপীড়িত হইতেছে, তাহারা অনেকেই হিন্দুবংশসম্ভূত। তরবারীর সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচার না হইলে এখনও তাহারা হিন্দুই থাকিত।

বীরাঙ্গনা।

অদ্ভুত রাজভক্তি।

রাজভক্তি মানুষের একটি সদ্‌গুণ বটে, কিন্তু তথাপি সকল অবস্থাতে ইহার প্রশংসা করিতে পারা যায় না। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে মানুষ রাজভক্তিবশতঃ অন্ধ হইয়া অত্যাচারী রাজার সহায়তা করিয়া স্বদেশের সর্ব্বনাশ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। এরূপ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য রাজভক্তি অবশ্য নিন্দনীয়, এবং এরূপ রাজভক্ত নরনারী

* ৩রা ভাদ্র ১৩০৭ সালের "সময়" দ্রষ্টব্য।

কখনই প্রশংসার পাত্র নহেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের শুধু নিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে। তাঁহাদের অপরাধ অমার্জ্জনীয় হইলেও একথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। রাজক্ষমতার উন্নতি সাধনার্থ তাঁহারা আহ্লাদের সহিত সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, এবং অবশেষে অম্লানবদনে প্রাণদান করিয়া তাঁহাদের শত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।

শতাধিক বর্ষ অতীত হইল ফরাসিদেশে একটি ভয়ানক রাজদ্রোহ ঘটিয়াছিল। তৎকালে যিনি ফরাসি সিংহাসনে আসীন ছিলেন, তাঁহার বিশেষ অপরাধ ছিল না। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের কুশাসনের ফল তাঁহার মস্তকে পতিত হইল। পদদলিত ফরাসিজাতি রক্তপিপাসু হইয়া মস্তক উত্তোলন করিল এবং অচিরে বিদ্রোহানলে রাজক্ষমতা একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল। যাঁহারা রাজার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল; কিন্তু তাঁহাদের রক্তে বিদ্রোহিগণের শোণিত-পিপাসার শান্তি হইল না। তখন রাজা ও রাণী প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বিদেশে আশ্রয় লইবার সংকল্পে গুপ্তভাবে রাজধানী ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে রাণীর এক পরিচারিকা ছিলেন। ইঁহার নাম মাধম ডি লাম্বল। রাজা ও রাণীর পলায়নকালে লাম্বলও উপায়ান্তর না দেখিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের সহগামিনী না হইয়া ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া তিনি শুনিলেন যে রাজা ও রাণী পথিমধ্যে ধৃত হইয়া পুনরায় বিদ্রোহিগণের হস্তে পতিত হইয়াছেন। এখন কি কর্ত্তব্য? তিনি ইংলণ্ডেই থাকিবেন, না পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন? ইংলণ্ডে থাকিলে অবশ্য তাঁহার নিজের প্রাণের আর কোন আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু তাঁহার প্রভুদ্বয়ের উপায় কি হইবে? বিদ্রোহীরা এবার নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রাণ বধ করিবে! কিন্তু যদি তাঁহাদেরই প্রাণনাশ হইল, তবে তাঁহার নিজের বাঁচিয়া থাকায় সুখ কি? যে বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় তিনি এত দিন জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন, যদি তাহাই কুঠারাঘাতে পতিত হয় তবে বৃথা জীবন ভার বহন করায় লাভ কি? মাদম ডি লাম্বল একজন প্রকৃত বীরাঙ্গনা ছিলেন, তাঁহার বীরহৃদয় মৃত্যুভয়ে অণুমাত্র ভীত হইল না। রাজা ও রাণী ধৃত হইয়াছেন শুনিবামাত্র তিনি বীরোচিত সাহস ও সংকল্পে হৃদয় বাঁধিলেন। "যদি বাঁচিতে হয় ত তাঁহাদের সঙ্গে বাঁচিব, নচেৎ তাঁহাদেরই সঙ্গে মরিব।" সুতরাং আর ইংলণ্ডে অবস্থান না করিয়া তিনি অচিরে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ফরাসিদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবা মাত্র

মাদাম ডি লাম্বল রা[illegible] ও রাণীর সহিত মিলিত হইলেন। বিদ্রোহিগণের মতে ইহাই তাঁহার অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু তথাপি আপনাদের ন্যায়পরায়ণতা দেখাইবার জন্য তাঁহারা বিনা বিচারে তাঁহার প্রাণবধ করিতে সম্মত হইলেন না। এক্ষণে বিদ্রোহিগণ কর্তৃক মাদম ডি লাম্বলের বিচার আরম্ভ হইল। এই বিচারের ফল কি হইবে, তাহা লাম্বল অবশ্য সহজেই বুঝিতে পারিলেন। বিদ্রোহীরা অভিযোগকারী, এবং তাঁহারাই বিচারকর্ত্তা, সুতরাং বিচারের ফল প্রাণদণ্ড ব্যতীত আর কি হইতে পারে? অল্প সময়ের মধ্যে বিচার শেষ হইয়া গেল। বিচারপতিগণের মতে লাম্বলের অপরাধিত্বে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি রাণীর পরিচারিকা, অতএব তাঁহাদের মতে তিনি দেশের শত্রু। তাঁহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়, অতএব তাঁহাদের বিচারে মৃত্যুই তাহার একমাত্র শাস্তি। কিন্তু তথাপি তাঁহারা আপনাদের দয়াশীলতার পরিচয় দিতে বিস্মৃত হইলেন না। লাম্বলের প্রগাঢ় রাজভক্তির বিষয় অবশ্যই তাঁহারা অবগত ছিলেন। তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে লাম্বল জীবন ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু রাজভক্তি ত্যাগ করিতে পারেন, এই কারণে হউক অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ হউক, তাঁহারা লাম্বলের নিকট একটি অতি হেয় প্রস্তাব করিলেন। "তুমি যদি স্বীকার কর যে এখন হইতে রাজা ও রাণী এবং দেশের শত্রুগণ তোমার ঘৃণার পাত্র, তাহা হইলে তুমি প্রাণদান পাইবে।" কিন্তু লাম্বল জীবনের জন্য কিছুমাত্র লালায়িত ছিলেন না। জগতের সামান্য নরনারীর পক্ষে জীবন মহামূল্য ধন বটে,কিন্তু তথাপি এই স্বার্থপর ক্ষুদ্রচেতা জগতে এরূপ দুই একজন দেবতুল্য লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা কখনই মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হন না। ইঁহারা স্বার্থান্ধ নর নারীর পথ প্রদর্শক জ্যোতি স্বরূপ—ইঁহারাই প্রকৃত বীর। অসহায়া শত্রু-পরিবেষ্টিতা লাম্বল একজন এই প্রকৃতির রমণী ছিলেন। তিনি তাঁহার বিচারকর্ত্তাদিগের প্রস্তাব শুনিয়া স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"স্বদেশীয়গণ চিরকালই আমার ঘৃণার পাত্র, কিন্তু রাজা ও রাণী কখনই ঘৃণার পাত্র হইতে পারেন না।" বোধ হয় বিচারপতিগণ এইরূপ উত্তরেরই প্রত্যাশা করিতেছিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ লাম্বলের প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিলেন। কর্ত্তব্য—পরায়ণা বীরাঙ্গনা লাম্বল অম্লানবদনে ঘাতকের অসিতলে মস্তক পাতিয়াছিলেন। অসির আঘাতে তাঁহার মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু ইহাতেও বিদ্রোহিগণের বৈরনির্যাতনের পরিতৃপ্তি হইল না। সেই ছিন্ন মস্তক বড়সার অগ্রভাগে বিদ্ধ হইয়া রাজধানীর পথে পথে প্রদর্শিত হইল, এবং এইরূপে অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুসভ্য ফরাসি জাতির যশঃ-সৌরভে জগৎ পরিপূর্ণ হইল

গীতগোবিন্দ।

গীতগোবিন্দ মহাকবি জয়দেব কৃত একখানি গীতকাব্য। এই গ্রন্থ দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। ইহাতে জয়দেব কবিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কবিতাগুলি অতিশয় মধুর ও প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট। গীতরূপে প্রায় সমস্ত কৃষ্ণচরিতই বর্ণিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় গীতগোবিন্দের ন্যায় রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়, কেবল গ্রন্থের সূচনা এবং সমাপিকাতে কয়েকটী কবিতা ও প্রত্যেক গীতের আরম্ভে অবতারণাসূচক ও সমাপিকাতে সমাপ্তিসূচক এক একটী শ্লোক রচিত হইয়াছে। গীতগুলিতে মূর্চ্ছনা, তান, লয় প্রভৃতির বিলক্ষণ সমাবেশ আছে। এই সকলের রচনা যদ্রূপ হৃদয়গ্রাহিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ সদ্ভাবশালিনী।

গীতগোবিন্দে প্রেমভক্তিরসের আধিক্য দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা দুঃসাধ্য হেতু যখন সগুণ শ্রীকৃষ্ণরূপ ধ্যেয়, তখন আদিরস বর্ণনা করা জয়দেবের উচিত হয় নাই। কিন্তু কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় বুদ্ধিমান্ ও সদ্ভাবগ্রাহী পণ্ডিতেরা এই গ্রন্থের সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং ভক্ত্যুচ্ছ্বাসিক প্রণালীতে মোহিত হইয়া উক্ত কারণে দোষ ব্যক্ত না করিয়া ইহার অশেষ গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা ইহার রূপক রচনার অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ দেশীয় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ যাঁহারা জয়দেবের চরণচিহ্ন অনুসরণ করিয়া পদরচনাদ্বারা খ্যাতনামা হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা দূরে থাকুক, বিদেশীয় অহিন্দু নানা বিদ্যাবিশারদ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিৎ অনেকেই গীবগোবিন্দ পাঠে মোহিত হইয়া তাহার মধুরভাব, মধুরচ্ছন্দ, নির্ম্মল ভক্তিপীযূষসিক্ত প্রবন্ধ আলোচনা করিয়া কিরূপ ভাষাছটায় ইহার গুণ কীর্ত্তন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। সর্ব্বপ্রথম সার উলিয়ম্ জোন্স ইংরাজী ভাষায়, পণ্ডিত ল্যাসন্ ল্যাটিন ভাষায়, রুকর্ট জর্ম্মণ ভাষায় এবং সুকবি এড্ উইন আর্ণল্ড ইংরাজী কাব্যে এই গ্রন্থের অনুবাদে এই গ্রন্থ সম্বন্ধীয় মহাপ্রয়োজন বিষয়ে অল্পাধিক সুন্দর মন্তব্য লিখিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ভাগবতের অধ্যাত্ম ভাবানুসারে ইহার অর্থ বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার অনেক টীকা ও অনেকগুলি প্রাচীন বঙ্গানুবাদ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে রসময় দাস ও কবি গিরিধর কৃত পদ্যানুবাদ প্রধান।

চৈতন্য দেব গীত গোবিন্দ পাঠানুরক্ত ছিলেন এবং তদর্থ বুঝাইতে আনন্দানুভব করিতেন, তাহা চৈতন্য চরিতামৃতে

বর্ণিত আছে। গীত গোবিন্দের গীতগুলি মাত্রা বৃত্তিতে রচিত এবং কেহ কেহ বোধ করেন ইহারই ছন্দঃ অনুসরণে হিন্দি বোলর চৌপেয়া প্রভৃতি কবিতা রচিত হইয়াছে।

গীতগোবিন্দে অষ্টপদবিশিষ্ট চতুর্বিংশতিটী গীত আছে, এজন্য এই মহাকাব্য অষ্টপদী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সচরাচর গানে যে প্রকার অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ প্রভৃতি চারিটী নির্দ্দিষ্ট পদ থাকে, অর্থাৎ গান মাত্রেই প্রায় চতুষ্পদ দেখা যায়, কিন্তু জয়দেবের গান অষ্টপদী হওয়া প্রযুক্ত ইহার অন্যথা দৃষ্টিগোচর হয়, বস্তুতঃ ইহাতে ফলের কোনও বিশেষ হানি হয় না। আরো গীতগোবিন্দের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোরং" প্রভৃতি কয়েকটী প্রসিদ্ধ গীত অষ্ট প্রকার তালে গীত হইত বলিয়া গীতগোবিন্দকে অষ্টতালীও কহা যায়।

এই গ্রন্থের পদগুলি এদেশে ও পশ্চিমাঞ্চলে গীত হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালায় এই সকল গায়কদিগের মধ্যে বিষ্ণুপুরনিবাসী ভূতপূর্ব্ব শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, তৎপুত্র কেশব ভট্টাচার্য্য এবং চুঁচুড়ার রামসুন্দর শীলের নাম সুপরিচিত। ইহাদের গানে শ্রোতৃবর্গ বিহ্বল হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

মহাকবি জয়দেব রাঢ়দেশে বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয়নদের উত্তরস্থ কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এই গ্রাম এক্ষণে কেন্দুলি বলিয়াই অধিক প্রসিদ্ধ। জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী এবং পত্নীর নাম পদ্মবতী দেবী। ভোজদেব কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণকুল সম্ভূত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতমের সন্তান। জয়দেব কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অনেক সুপণ্ডিতদিগের মতে তিনি লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক।

জয়দেব অত্যন্ত করুণ-হৃদয় ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। ভক্তি-বিলসিত-মহত্ত্বচ্ছটা ও প্রবীতিব্যঞ্জক উদার ভাব উভয়ই তাঁহার অন্তকরণে নিরন্তর প্রতিভাসিত হইত। তিনি স্বকীয় জীবনার্দ্ধকাল কেবল উপাসনা ও ধর্ম্মঘোষণাতেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহার ন্যায় পরম ভাগবত নিতান্ত বিরল ছিল। জয়দেবের বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ, নিত্য গঙ্গাস্নান, মৃত পত্নীর পুনর্জ্জীবিত হওয়া, গীত গোবিন্দের উৎকর্ষাপকর্ষ এবং "স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" এই গীতের বক্রী অংশ "দেহি পদপল্লবমুদারং" লিখন বিষয়ে অনেকগুলি অলৌকিক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এখানে একটী মাত্র উল্লেখ করিতেছি। জয়দেব "মম শিরসি মণ্ডনং (অর্থাৎ আমার) (শ্রীকৃষ্ণের) মস্তকে ভূষণ স্বরূপ) পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রভুর মস্তকে পদার্পণের কথা লিখিবার ভয়ে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'

অর্থাৎ 'তোমার (শ্রীরাধার) উদার পদ পল্লব অর্পণ কর' অংশটী সাহস করিয়া লিখিতে না পারিয়া পুঁথি বন্ধ করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সামান্য নায়কের ন্যায় বর্ণিত হইলেও ভক্তের অপরাধ গ্রহণ করেন না, সুতরাং, ভক্তের দাস শ্রীহরি, জয়দেবের ভাগীরথীতে স্নানগমন সুযোগে, স্নান-প্রত্যাগত জয়দেব রূপ ধারণপূর্ব্বক তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া, জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতীর প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া, স্বহস্তে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই পদটী পুঁথিতে লিখিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। জয়দেব স্নানান্তে প্রত্যাগত হইয়া, পদ্মাবতীকে অগ্রে ভোজন করিতে দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। জয়দেব জানিতেন, পদ্মাবতী প্রাণান্তেও তাঁহার ভোজনের পূর্ব্বে জলগ্রহণ করেন না। জয়দেব পত্নীর মুখে পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ও নিজের পুঁথি খুলিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে,ভগবান্ শ্রীহরি স্বয়ং আসিয়া লিখিয়াছেন। তখন তিনি আনন্দে মত্ত হইয়া ও আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া, শ্রীহরির ভোজনাবশিষ্ট যে অন্ন ছিল এবং যাহা পদ্মাবতী ভোজন করিতেছিলেন, সেই অন্ন লইয়া ভোজন পূর্ব্বক আত্মাকে পরম পবিত্র বোধ করিলেন।

গীতগোবিন্দ-তত্বজ্ঞ হিন্দু ও অহিন্দু উভয় শ্রেণীর মহাত্মারা তাঁহাদের মন্তব্যে প্রকাশ করেন যে জীবাত্মা পরমাত্মার একটী রূপ হইয়াও মায়া বলে অহংভাবে পরমাত্মাকে বিস্মৃত হইয়া থাকে। আরাধনায় জাগরিত হইয়া আপনার অবস্থা বুঝিতে পারে। তখন পরমাত্মার বিরহে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে তন্নিকটে উপস্থিত হইয়া স্ফূর্ত্তচিত্তে পবিত্র প্রেম রসে মুগ্ধ হয় এবং তাঁহাতে লীন হইয়া পরমানন্দে ভাসমান হইয়া থাকে। গীত গোবিন্দের রূপক বর্ণনায় ইহাই গুহ্যভাবে নায়ক নায়িকার কথার ছলে প্রকাশ। এইরূপ গুহ্যভাবে ঈশ্বর ভক্তির বর্ণনা পারস্য ভাষায় হাফেজ মহাকবির গ্রন্থে প্রচারিত আছে।

পাঠিকাগণের বিদিতার্থ গীত গোবিন্দের একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা ও স্বরলিপি স্থানান্তরে প্রকটিত হইল।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত।

স্বরসাধন প্রণালী।

(৩৬৩ সংখ্যা ৩৬৮ পৃষ্ঠার পর)

গীতগোবিন্দ।

প্রথম সর্গ। ১ম শ্লোক।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়। ইথং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং, রাধা-

মাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ।

এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ কি বলা দুঃসাধ্য, কেননা পণ্ডিতেরা তদ্বিষয়ে একমত নহেন, এক এক জন এক এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রবোধানন্দ গোস্বামী মহাশয় যে অর্থ করেন, তাহা অধিক সঙ্গত বোধ হওয়াতে নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

এক দিন গোপরাজ নন্দ নিজে গোদোহনার্থ সন্ধ্যার সময় গোষ্ঠে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দ কৃষ্ণকে দেখিয়া ভীত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ রাধিকাকে কহিলেন, "রাধে! দেখ আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন এবং তমাল বৃক্ষরাজিতে বনভূমি শ্যামবর্ণ হইয়াছে, এই বালক শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিতে একাকী যাইতে ভীত হয়, অতএব তুমি ইহাকে গৃহে লইয়া যাও।" মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্স এই অর্থই গ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু আর্ণল্ড সাহেব এই শ্লোকের যে গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই:—

"The sky is clouded; and the wood resembles the sky, thick-arched with black Tamala boughs; "O Radha Radha! take this soul, that resembles in life's deep midnight to thy golden house." So Nanda spoke, and led by Radha's spirit the feet of Krishna found the road aright. Wherefore in bliss which all high hearts inherit together, taste they Love's divine delight.

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী সঙ্গীত অধ্যাপক শ্রী ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়, তাঁহার প্রকাশিত গীতগোবিন্দে, সৌরটী রাগিণী ও তিওট তালে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রী ত্রিভুবন ও শ্রীসজীবন পাঠক দ্বয় কুকুভা রাগিণী ও ঠুংরী তালে পাঠ করিতেন। এবং কোন কোন ভক্ত রাগ ভৈরব ও ত্রিতালীতে গাইয়া থাকেন।

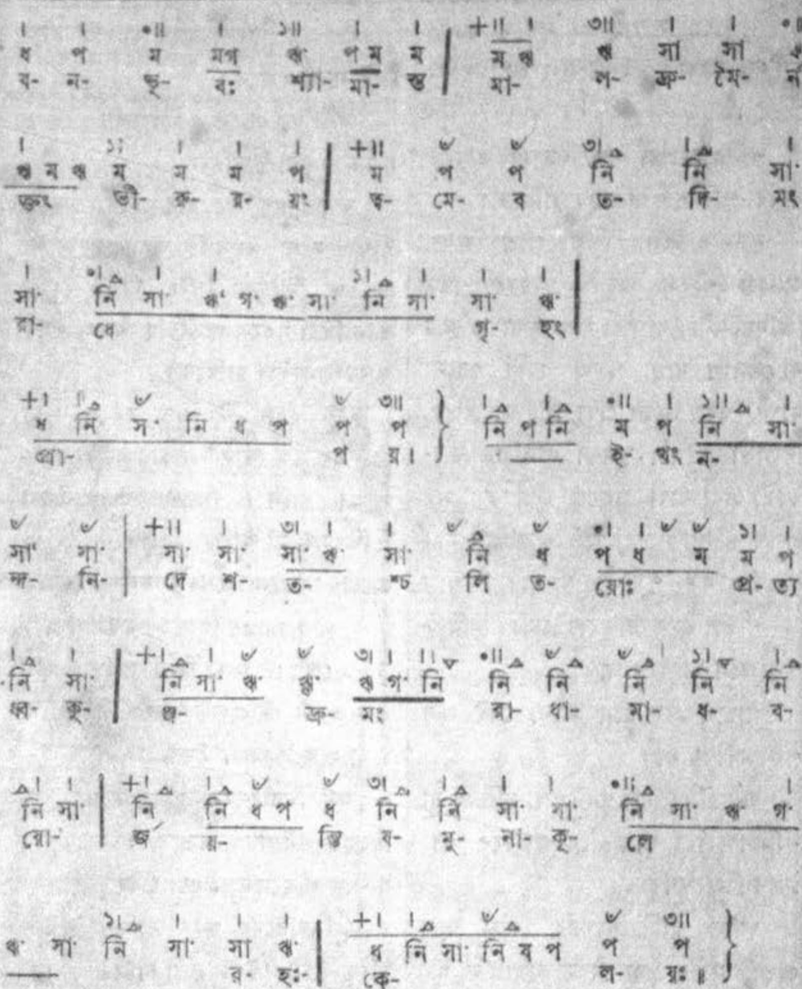
সুরট বা সৌরটী রাগিণী। তাল তিওট।* নি

॥	•॥ ।	১। ।	। ।	+।	।	৺	.	৺	৩।
নি	নি সা·	সা· নি	সা· ঋ·	ধ	নি	সা·	নি ধ প	প	প
মে-	ঘৈ-	মে-	দু- র-	ম				ম্ব	রং

---

* সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা "ত্রিপুট" নামে খ্যাত। তেওটের চারিটী পদ, তিনটী আঘাত ও একটী ফাঁক। ইহার প্রথম ও তৃতীয় পদ চারি মাত্রায় পূর্ণ। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদ তিন মাত্রাযুক্ত। অতএব তেওট চৌদ্দ মাত্রাযুক্ত। ইহার ঠেকা যথা,—

১।	।	।	।	÷।	।	।	।	।	।	।	•।	।	তেটে
ধিন্	ধিন্	ধা	তেটে	ধিন্	ধা.	তেটে	ধিন্	ধিন্	ধা	তেটে	তিন	তা	তেটে



পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৬৩ সংখ্যা ৩৬৬ পৃষ্ঠার পর)

ওলাউঠার সময় সাবধানতা।

ওলাউঠা যে অতি ভয়ানক রোগ সে পরিচয় কাহাকেও দিতে হয় না। প্রকৃত ওলাউঠায় উপযুক্ত ঔষধ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই বলিলেই হয়। ওলা-

উঠা সঞ্চারে সাবধানতা সম্বন্ধে কয়টী স্থূল ২ জ্ঞাতব্য নিয়ম উল্লেখ করা যাইতেছে।

শরীর, কাপড়, ঘর, বিছানা প্রভৃতি সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

নুতন চাউলের কিম্বা পান্তা ভাত, অত্যন্ত শীতল অথবা অত্যন্ত গরম জিনিস, কাঁচা বা পচা ফল, পচা শুঁকুটে বা ভেলাল মাছ, অথবা চর্ব্বি ওয়ালা মাংস, তেলে ভাজা দ্রব্য, পিঁয়াজ, রসুন, বিলাতী বা মিঠা কুমড়া প্রভৃতির তরকারী এবং যাহা সহজে জীর্ণ হয় না, এরূপ গুরুপাক দ্রব্য আহার করিবে না।

নিয়মিত পুষ্টিকর আহার বিধেয়।

শীতল জলে স্নান করিবে। অধিকক্ষণ জলে থাকিবে না।

খারাপ জলে স্নান অথবা সেই জল পান করিবে না।

অনিয়মিত পরিশ্রম কিম্বা দুশ্চিন্তা না করিয়া সর্ব্বদা শান্তভাবে থাকিবে এবং ঈশ্বর চিন্তা করিবে।

অধিক রাত্রি জাগরণ, কিম্বা সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না।

এক ঘরে অধিক লোক বাস বা নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে।

শরীরে অধিক হিম লাগাইবে না।

কোন স্থানে মহামারি আরম্ভ হইলে, যত শীঘ্র পার সে স্থান ত্যাগ করিবে।

রোগীর মল মূত্রাদি সংযুক্ত বস্ত্রাদি চব্বিশ ঘণ্টার অধিকক্ষণ না রাখিয়া পুড়াইয়া ফেলিবে। মল ও বমি মাটিচাপা দিবে। একবার পাতলা বাহে বা বমি হইলেই সতর্ক হইবে।

প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে ঘরে গন্ধক ও ধুনা পুড়াইবে।

সর্ব্বদা কর্পূরের ঘ্রাণ লইবে। অথবা বাড়ীর মধ্যে এমন কি সকল গৃহ কর্পূর ও হিঙ্গু নেকড়ায় বাঁধিয়া ঘরের যে যে স্থান দিয়া সকলে গতিবিধি করে, সেই স্থানে ঝুলাইয়া রাখিবে।

এই রোগ উপস্থিত হইলে শীঘ্র চিকিৎসককে আহ্বান করিবে, চিকিৎসকের আসিতে বিলম্ব হইলে অথবা চিকিৎসক না পাইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কর্পূর ১ গ্রেণ হিঙ্গু ১ গ্রেণ, পিঁপুলিচুর্ণ ১ গ্রেণ। জল দিয়া মাড়িয়া এক এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে, এবং তাহা ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

অম্ল নিবারণ জন্য সোডা ও পটাস দিবে। নিদ্রার অভাব হইলে, অল্প মাত্রায় অহিফেন দেওয়া যাইতে পারে। বমন নিবারণের জন্য তার্পিণ তৈলের সহিত ফোমেন্টশন করা যাইতে পারে। মস্তক উষ্ণ হইলে কেশ মুণ্ডন করিয়া শীতল জল দিবে।

শ্বেত অপাঙ্গগাছের একটি শিকড় সাতটি গোল মরিচের সঙ্গে মিলাইয়া পেষণ করিবে, পরে উহা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর তিনবার খাইলে ভেদ বন্দ হইবে। যদি রোগীর পিপাসা অধিক হয় তবে বড় এলাচি পোড়াইয়া ঐ দানা গুড়া করতঃ

জলের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইলে পিপাসা বন্ধ হইবে।

ওলাউঠার আরম্ভাবস্থায় ক্যাম্ফর (কর্পূর) ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে।

গরম ভাতের ফেণ কিম্বা জলের সহিত পুদিনা পাতা বাটিয়া সরবৎ করিয়া খাইলে অথবা কর্পূর ও হিঙ্গের আঘ্রাণ লইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

আফিম ২ মাসা, হিঙ্গু ২ মাসা, গোল মরিচ ২ মাসা, ও কর্পূর ২ মাসা, একত্র পেষণ করিয়া ও জল দিয়া মাড়িয়া, ১৫টী প্রস্তুত করিবে। পরে একটী খাওয়াইবে, যদি ভেদ বন্ধ না হয় ২ ঘণ্টা অন্তর ৩।৪টী খাওয়াইবে তাহাতে বিশেষ উপকার হইবে।

গাত্র দাহ থাকিলে, হরিদ্রা চুর্ণ ও শুঁঠ চুর্ণ মাখাইবে।

একটু ডহর করঞ্জার ফল, হরিদ্রা, বনমাতুলুঙ্গ মূল; জলে বাটিয়া, ছায়ায় শুকাইয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে বিসূচিকা রোগ নষ্ট হয়।

পাথর কুচির পাতার অর্দ্ধ খানা, ৩টী গোলমরিচ সহ বাটিয়া খাইতে হইবে। উক্ত পাতার অপরার্দ্ধ খান ৩টী গোলমরিচ সহ বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিবে। ইহাতেই রোগীর প্রস্রাব হইবে ও বাহ্যে বন্ধ হইবে। যদি একবার খাইলে প্রস্রাব হয় তবে আর খাইতে হইবে না, নতুবা উক্ত ঔষধ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিবে।

সন্তানের ধর্ম্মশিক্ষা।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের অধোগতির প্রধান কারণ যে ধর্ম্মহীনতা, তাহা সূক্ষ্মদর্শী বিবেকী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতেছেন। ভারতের পুনরুদ্ধারেরও প্রধান উপায় ধর্ম্মোন্নতি। কিন্তু সন্তান বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মভাবে গঠিত না হইলে সমাজ মধ্যে এই ধর্ম্মোন্নতি প্রকৃষ্টভাবে সাধিত হইতে পারে না। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা সমাজের নেতা ছিলেন, তাঁহারা সন্তানদিগকে উপনয়ন ও দীক্ষা দ্বারা ধর্ম্মজীবনের পথে অগ্রসর করিতেন। বালকের জ্ঞানোদয় হইলে তাহার উপনয়ন হইত। তৎপরে সে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করিয়া যথাবিধি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ও গঠিত-চরিত্র হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনের জন্য সংসারে প্রবেশ করিত। ইহাতে ব্রাহ্মণের সংসার—ধর্ম্মের সংসার হইয়া প্রকৃত সুখের আলয় হইত। ব্রাহ্মণেতর আর্য্যজাতি সকল ব্রাহ্মণের জীবনের আদর্শে এবং ব্রাহ্মণের প্রদত্ত বিধি ব্যবস্থানুসারে জীবন গঠন করিয়া ধর্ম্মজীবনের অধিকারী হইত। এইরূপে জনসমাজ ধর্ম্মভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া

ইহাকেই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধনের উপায়রূপে অবলম্বন করিয়া চলিত।

সমাজের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন হিন্দুসমাজে পূর্ব্বতন বিধি ব্যবস্থার মৃত কায়া বা ছায়ামাত্র আছে,প্রাণের চিহ্ন অতি অল্পমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাই যাঁহাদিগের মধ্যে উপনয়ন ও ধর্ম্মদীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাঁহারাও তাহা একটি কৌলিক নিয়ম মাত্র বলিয়া রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা উন্নত জীবন গঠনের প্রয়াসী হন না। আর তাঁহাদের বাহিরে কোটী কোটী লোক রহিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্মোন্নতির প্রকৃত উপায় লাভেও বঞ্চিত। বর্ত্তমানকালে মুখে সকলে স্বীকার করুন আর নাই করুন, অনেক পরিমাণে সাম্যের কাল উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্ব কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে যে দুরপনেয় বৈষম্য ছিল, কার্য্যতঃ এখন তাহা অল্পই আছে। আর স্ত্রী শূদ্রকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনধিকারী বলিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া রাখা যায় না। এখন ধর্ম্ম সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহা সকলেরই গ্রহণীয় এবং পিতা মাতা পুত্র কন্যা উভয়কেই যেমন বিদ্যাশিক্ষা দিতেছেন, সেইরূপ ধর্ম্মশিক্ষা দানের জন্যও দায়ী। সন্তান সকল বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মভাবে সংগঠিত হইলে গৃহ সকল ধর্ম্মময় হইবে এবং জনসমাজ সহজে ধর্ম্মপ্রাণে পুনরুজ্জীবিত হইবে। ধর্ম্মপ্রাণতা হইতেই ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও জাতিগত বল বীর্য্য, সুখশান্তি, ঐশ্বর্য্য ও মহত্ত্ব সকলই লাভ হইবে।

হিন্দুসমাজের ব্যবস্থাপক প্রাচীন ঋষি মুনিগণ গায়ত্রী মন্ত্রের উপাসক ছিলেন এবং সন্তানদিগকে শৈশব হইতে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন। এই গায়ত্রী বেদমাতা এবং ইহা সকল ধর্ম্মের সার। ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন বিশাল বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই গায়ত্রী বীজ হৃদয়ে উপ্ত হইলে এবং প্রতিদিন ভক্তির সহিত তাহার পরিচর্য্যা হইলে তাহা হইতে ধর্ম্মজীবনরূপ মহাবৃক্ষ বিকাশিত হইবে আশা করা যায়। তবে ইহা কেবল জাতিবিশেষে বা শ্রেণী বিশেষে বদ্ধ থাকিবে কেন? ঈশ্বরের সূর্য্য চন্দ্র জল বায়ুতে যেমন জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল নরনারীর অধিকার—ঈশ্বরের উপাসনাতেও সেইরূপ। আমরা সাধারণের গোচরার্থ একটী সংস্কৃত উপনয়ন অনুষ্ঠান ও তদুপলক্ষে প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

শ্রীমান্ সুকুমার দত্তের শুভ উপনয়ন উপলক্ষে ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ।*

৪ঠা চৈত্র রবিবার।

ব্রহ্মোপাসনায় মনুষ্যমাত্রেরই অধি-

* এই উপনয়ন বিনা-উপবীতে সম্পন্ন হয়। গত ২০এ ফাল্গুন শ্রীমন্মহর্ষির পার্ক ষ্ট্রীট ভবনে বালক গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। কয়েক দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান ও গায়ত্রীদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা অভ্যাস পূর্ব্বক সমাবর্ত্তিত হইলে ব্রহ্মোপাসনান্তে মহর্ষি এই উপদেশ প্রদান করেন।

কার। দেশভেদ নাই, কালভেদ নাই, জাতিভেদ নাই, ব্রহ্মোপাসনাতে মনুষ্য-মাত্রেরই অধিকার; যেহেতু ব্রহ্ম এক পিতা, সকল মনুষ্যই তাঁহার সন্তান! অতএব যে মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, তাহাতেও সকল মনুষ্যের অধিকার। সেটী গায়ত্রী মন্ত্র। এই দেশের পূর্ব্ব-কালের ঋষিরা সকল বেদ মন্থন করিয়া ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটী মন্ত্র উদ্ধার করিলেন, সেই মন্ত্র গায়ত্রী মন্ত্র। ঋষিরা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেনঃ—

"প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।" *

এই মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা হয়। আত্মা পরমাত্মার যে যোগ, তাহাও এই মন্ত্রে রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কি হিন্দু, কি অহিন্দু সকলেই এই মন্ত্রের অধিকারী। আমরা ব্রহ্মোপাসক হইয়া উন্নত ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া এই কথা বলিতেছি, গায়ত্রী মন্ত্রে সকল মনুষ্যই অধিকারী।

গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা সাবিত্রী ব্রত গ্রহণ করা হয়। জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার আরাধনা এই, সাবিত্রী ব্রত বিধিপূর্ব্বক গ্রহণ না করিলে ইহাতে কোনও ফল হয় না। অতএব ব্রহ্মবিদ্ পিতামাতা যাঁহারা আপনাদের বংশ পবিত্র করিতে চান, তাঁহাদের কর্ত্তব্য উপযুক্তবয়স্ক বালককে কোনও ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের নিকট উপস্থিত করেন। সেই আচার্য্য তাঁহাকে ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা দিবেন—যাহাতে সেই অজর অমর অভয় পুরুষকে জানিতে পারে, তাহার উপদেশ দিবেন। উপনীত বালকের কর্ত্তব্য, অবলম্বিত ব্রত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাবজ্জীবন পালন করিবে। ইহাতে ব্রহ্মকে লাভ করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

সুকুমার,

তুমি যে সাবিত্রী-ব্রত অদ্য বিধি-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে, ইহা চিরজীবন যত্ন পূর্ব্বক পালন কর, এই আমার উপদেশ। গায়ত্রী মন্ত্র কি? তাহা তুমি শিক্ষা করিয়াছ। হৃদয়ের প্রেম ভক্তিসহকারে সেই গায়ত্রী মন্ত্রের দেবতা যে পরমেশ্বর প্রতিদিন তাঁর উপাসনা করিও, কখনও ভুলিও না। তাহা হইলে উত্তরোত্তর সিদ্ধিলাভ করিবে। সংসিদ্ধ হইলে ব্রহ্মকে লাভ করিবে—ব্রহ্মলাভে মুক্তি-লাভ হইবে।

"অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি"

---

*যে পরমব্রহ্মে আত্মা প্রতিষ্ঠিত আছে, প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিন দ্বারা তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। প্রণব ওঁ, ব্যাহৃতি-ভূর্ভুবস্বঃ, গায়ত্রী-তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ইহার অর্থ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ভূলোক, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোকের প্রকাশক সেই জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

ইহাতে মর্ত্ত্যজীব অমর হয়। "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" এখানেই ব্রহ্মকে উপভোগ করে। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তোমার অবলম্বিত ব্রত পালনে সমর্থ হও।

বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীদিগের অবস্থা।

(৩৬৩ সংখ্যার ৩৬১ পৃষ্ঠার পর)

ভারতে যে সকল খ্রীষ্ট ধর্ম্মপ্রচারক এ দেশের অবস্থা পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা অনেকে স্বদেশে গিয়া ভারতবাসিনীদিগের দুরবস্থার কথা সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিলেন। এদেশের বহুবিবাহ, সহমরণ, স্ত্রীজাতির অজ্ঞানতা, মূর্খতা, পরাধীনতা প্রভৃতি শুনিয়া সাম্যবাদী ইউরোপীয় পুরুষ ও রমণীগণ বড়ই দুঃখিত হইলেন। ইংরাজের দুঃখ, বাঙ্গালির দুঃখের মত দুই ফোঁটা চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইবার নহে। তাই ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষগণ অনেক স্থানে সভা সমিতি স্থাপন করিয়া এদেশের স্ত্রীজাতির জন্য বহু আন্দোলন করিতে লাগিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মাচার্য্যদিগের হস্তে ভারত মহিলার মঙ্গলের জন্য অনেকে প্রচুর ধনও দান করিতে লাগিলেন।

এই সকল ভারতহিতৈষিণী রমণীগণের মধ্যে কুমারী কুক্ একজন শ্রেষ্ঠতম। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগে ভারতবর্ষের (বাঙ্গালির?) সাধারণ পুরুষদিগের শিক্ষার সহায়তা করিতে, ইংলণ্ডীয় সভাকর্ত্তৃক কুমারী কুক্, এদেশে প্রেরিত হন। এদেশের রমণীগণের হীনাবস্থা দেখিয়া স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি করিতেই ইনি আত্মোৎসর্গ করেন। এই মহাপ্রাণা বিদ্যোৎসাহিনী রমণীরত্ন হইতে ভারত মহিলাগণ যে কিরূপ উপকৃতা, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্ত্রী শিক্ষা প্রচারের জন্য ইনি এত যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করেন যে তাহারই ফলে এদেশে এক বৎসরের মধ্যে ৮টী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত এবং ১১৪টী বালিকা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্তা হয়। এই সকল বালিকা দেশীয় নিম্ন শ্রেণীর ও খ্রীষ্টান বংশসম্ভূতা। এদেশীয় নীচজাতীয় মাতা পিতাকে অর্থ দানে সম্মত ও সন্তুষ্ট করিয়াই কুমারী কুক্, তাহাদিগের কন্যাগণকে বিদ্যালয়ে আনিতে সক্ষমা হইয়াছিলেন।

কিন্তু এইরূপ শিক্ষা বিস্তারেও মহাপ্রাণা কুক্ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। কারণ, তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া হিন্দু মহিলাদিগকেই সুশিক্ষাহীনতার জন্য অধিকতর অভাবগ্রস্তা বলিয়া জানিতেন। সেই সকল মহিলা ও বালিকাদিগের শিক্ষা বিষয়ে কোনও সুবিধা হইল না—বালিকাবিদ্যালয়ে কোনও সম্ভ্রান্ত হিন্দু নিজ কন্যা বা ভগিনীকে পাঠাইতে সম্মত

হইলেন না; কাজে কাজে তাঁহার মনে একটী বিষম অপরিতৃপ্তি থাকিয়া গেল; যাহাতে সম্ভ্রান্ত রমণীগণের শিক্ষার অভাব দূর হয়, কুমারী কুক তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কুমারী যখন স্ত্রীশিক্ষার জন্য এইরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে বিধাতার অনুগ্রহে আর এক অনুকূল ঘটনা সংঘটিত হইল। যিনি ভারতের পরম হিতৈষী, সংস্কৃত ভাষার একান্ত অনুরাগী, সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী, পণ্ডিতবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহোদয়ের এক প্রধান শিষ্য—সেই মহাত্মা উইলসন সাহেবের সহিত কুমারী কুকের শুভ বিবাহ সংঘটন হইল। এ বিবাহ ভারতের পক্ষে "মণিকাঞ্চন যোগ।" দম্পতী একহৃদয় হইয়া ভারত-হিতৈষণায় আত্মোৎসর্গ করিলেন।

বিবাহের পরে শ্রীমতী উইলসন অনাথ, আতুর, মূর্খ ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগের অভাব পূর্ণ করিতে একান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দয়া, তাঁহার স্নেহ এ দেশের অনাথ দরিদ্রগণকে মরণাধিক যাতনা হইতে মুক্তি দিতে লাগিল। সেই সব হতভাগ্যগণ উইলসন দেবীকে মাতৃরূপেই পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিবি উইলসন সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের সুশিক্ষার জন্যও এক উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ সুশিক্ষাপ্রাপ্ত ও কৃতবিদ্য হইয়া অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে পারিবে, তাহাতে ধনী রমণীর-ভদ্রবংশীয়া রমণীর প্রকৃত সুশিক্ষা লাভ হইবে, এই আশয়ে শ্রীমতী উইলসন তাঁহার ছাত্রীদিগকে শিক্ষয়িত্রীর উপযুক্ত করিয়া গঠন করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এহেন পর-হিতকর-ব্রত-পরায়ণা, এহেন নারীহিতৈষিণী দেবীর নাম ভারত-বক্ষে ও ভারতরমণী-বক্ষে অমৃতাক্ষরে লিখিত থাকাই উচিত।

মণি খনির ভিতর থাকিলেও মনোহর প্রভা বিকীর্ণ করে; ফুল বনের নিভৃত স্থানে ফুটিলেও তাহার সৌরভ দিগন্ত প্লাবিত করে; গুণী ব্যক্তি লুক্কায়িত থাকিলেও তাঁহার সদ্গুণ অন্যের হৃদয় আকর্ষণ করে। তাই হিন্দু-সমাজ কিছুদিনের মধ্যেই দেবী উইলসনকে চিনিল। তিনি বিদেশবাসিনী ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী করিলেন। উইলসন কৃতকার্য্য হইয়া আরও কয়েকটী স্বদেশীয়া মহিলাকে নিজের সহযোগিনী করেন; ইঁহাদিগের নিকটে কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুকন্যা বাঙ্গালা ও ইংরাজিভাষা, উলের ও সূচের কাজ শিখিতে লাগিলেন। এই সময়ে কলিকাতায় অনেক বামাহিতৈষী ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার জন্য বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া সাধারণের মন আকর্ষণার্থে চেষ্টা করেন।

এইরূপ শিক্ষালাভের সহিত স্ত্রী-

জ্যোতির ভূত প্রেতে বিশ্বাস, উলকি, মিসি, ও সিন্দূরের বহুল ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। এই সময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা আলোচনা করিলে বোধ হয় যে ভারতবাসিনীদিগের দুর্ভাগ্য নিশিতে শুকতারা জ্বলিয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগের ভাগ্য এত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগের মধ্য সময়ে এদেশের কতকগুলি তরুণবয়স্ক পুরুষ খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এইজন্য হিন্দুসমাজ খ্রীষ্টানের উপরে, সাহেব বিবিদিগের উপরে বড়ই চটিয়া গেলেন। বিলাতী বিবিদিগের হস্তে অন্তঃপুর শিক্ষার ভারার্পণ করিতে অনেক হিন্দুর নানারূপ আশঙ্কা জন্মিল; সুতরাং যেরূপে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার হইতেছিল, তাহা রহিত হইয়া গেল।

কিন্তু এইরূপে স্ত্রীশিক্ষা রহিত হইলেও স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য এ দেশের অনেক পুরুষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সহমরণ নিবারণের জন্য এদেশে তুমুল আন্দোলন চলিল। ভারতের উজ্জ্বলতম রত্ন রাজা রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির এক পরম হিতৈষী ছিলেন; সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে তিনিই সর্ব্ব প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার পরিবারস্থা কোনও রমণীকে সহমৃতা হইতে দেখিয়া স্ত্রীজাতির সহমরণ নিবারণ জন্য তিনি অধিকতর চেষ্টা করেন। স্বর্গীয় দ্বারকা নাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী প্রভৃতি কয়েক জন মহাত্মা এই বিষয়ে রাজা রামমোহনের বিশেষ সহায়তা করেন। বিদেশীয় রাজপুরুষদিগের অনেকে যে এ দেশের সহমরণ নিবারণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সকল সমবেত চেষ্টার ফলে বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগে, লর্ড বেণ্টিঙ্ক মহোদয় (১) সতীদাহ নিবারণ বিধি বদ্ধ করেন। সেই অবধি ভারতে সে নৃশংস প্রথা রহিত হইয়া যায়।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে এদেশে পুরুষদিগের মধ্যেও অনেক উন্নতিকর কার্য্য হইয়া স্ত্রীজাতির ভবিষ্যৎ-উন্নতির পথ সম্প্রসারিত করে। পুরুষদিগের পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা শিখিবার জন্য মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়; মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হয়; বঙ্গভাষায় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। ইতিপূর্ব্বেই রাজা রামমোহন রায় কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। রাজা রামমোহন রায় সত্যধর্ম্ম অনুসন্ধিৎসু ছিলেন; তিনি নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাসানুসারে একেশ্বরবাদী হইয়া, ১৮২৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন।* এই সকল ঘটনা হইতে

---

(১) উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।

* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বঙ্গভূমির বহু উপকারী। ধর্ম্মোন্নতি, ভাষার উন্নতি,দেশের লোকের মানসিক উন্নতি প্রভৃতি বহুতর কার্য্য করেন। স্ত্রীলোকদিগকে কেবল জীবন্ত দাহন হইতে রক্ষা করেন নাই। তাহাদিগের শিক্ষা, তাহাদিগের স্বত্বাধিকার ও তাহাদিগের প্রকৃত জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি বিষয়েও অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন।

দেশীয় পুরুষদিগেরও হৃদয়ের উন্নতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় মহিলাদিগের সহিত হিন্দুমহিলাগণের সংস্রব দূর হইলে, এদেশে বামাহিতৈষিগণ স্ত্রীশিক্ষা পুনঃ প্রচলনের জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কলিকাতার রাজা রাধাকান্ত দেবও স্ত্রীশিক্ষার এক প্রধান সহায়। ইঁহার পরিবারস্থ রমণীদিগের অনেকেই লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। ইনি, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ কিছুই বন্দোবস্ত হইল না। হিন্দুসমাজে কোনও কোনও কৃতবিদ্য যুবক নিজ নিজ কন্যা ভগিনী প্রভৃতিকে লেখা পড়া শিখাইতেন। ইহার পরে—গত শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগের শেষভাগে ব্রাহ্ম সমাজের যুবকগণ নিজ নিজ পরিবার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা—সুনীতি ও সভ্যতা সহ স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করেন। এই সকল যুবক কেহ কেহ স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

ইহার পরে তৃতীয় যুগের আরম্ভ। তৃতীয় যুগ ভগবানের কৃপায় ভারতমহিলাদিগের শুভ স্মরণীয় যুগ। এই যুগে স্ত্রীজাতির ভাগ্য যে রকম পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তাহা মনে করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

মহাত্মা বেথুন সাহেব গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিষয়ক সভার সভাপতি ছিলেন। স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য যে সকল বিদেশীয় মহাত্মা চেষ্টা করিতেছিলেন, বেথুন সাহেব তাহার মধ্যে এক প্রধান ব্যক্তি। খৃষ্টিয়ানদিগের স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয় হইতে ভারতরমণীদিগের শিক্ষা প্রাপ্তির আশা নাই দেখিয়া, বেথুন স্কুলের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কার্য্যও ভালরূপ চলে নাই, এবং কোনও সম্রান্ত হিন্দু বেথুন স্কুলে কন্যা প্রেরণও করেন নাই। যাহা হউক, এক বৎসরের মধ্যে উক্ত বিদ্যালয় শিমুলিয়াতে স্থাপিত হয় ও উহার প্রধান শিক্ষক, স্ত্রী-শিক্ষার পরমোৎসাহী মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রথমতঃ নিজ কন্যাদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করাইতে প্রবৃত্ত হন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই কাজে দেশের কত লোকে বিরক্ত হইয়াছিল, কত লোকে উপহাস করিয়াছিল, কত লোকে গালি দিয়াছিল, কিন্তু তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ বীরের ন্যায় সবই সহিয়াছেন! তাঁহার পরে হাইকোর্টের জজ্ শম্ভুনাথ পণ্ডিত নিজ কন্যাকে বেথুন স্কুলে প্রেরণ করেন। সে সময়ে দেশেও স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ আন্দোলন চলিতেছিল—এ সকল দেখিয়া শুনিয়া এবং বেথুন সাহেব নিরপেক্ষ ভাবে হিন্দু পণ্ডিতদিগের দ্বারা বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, সেখানে নীচ বা অসচ্চরিত্র লোকের কন্যাদিগের সংস্রব নাই, এ কথা জানিয়া ক্রমশঃ দেশের অনেক ব্যক্তি বেথুন স্কুলে কন্যা

ভগিনীদিগকে প্রেরণ করেন। কিছুদিন পরে, ভারত মহিলাদিগের পিতৃস্থানীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে, বেথুন স্কুলের সম্পূর্ণ ভার সমর্পিত হয়।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশবাবস্থা। রামায়ণ মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি কয়খানি পদ্যগ্রন্থ ব্যতীত স্ত্রী-পাঠ্য পুস্তক মিলিত না। এই অভাব দূর করিতে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর মহাশয় কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন ও সঙ্কলন করেন। বেথুন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে এই সকল পুস্তক ও কিছু কিছু ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইল। কিছু দিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা বিভাগ হইতে (তখন তিনি শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন) ৪০টী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। রাজ-অনুগ্রহে পল্লিগ্রামেও অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতের বহু-প্রদেশে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল এবং গবর্ণমেণ্ট বালিকা বিদ্যালয়ে বৃত্তি পুরস্কার প্রভৃতি প্রবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীশিক্ষার অধিকতর উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন।* গত শতাব্দীর তৃতীয়যুগে স্ত্রীশিক্ষার এতদূর উন্নতি হইয়াছিল।

কেবল শিক্ষা বিষয়ে নহে, এ যুগে অন্যান্য বিষয়েও ভারতবাসিনীদিগের সৌভাগ্য পরিস্ফুট হইতেছিল। এ দেশে শিশুবিবাহ প্রচলিত থাকায় অনেক অজ্ঞান বালিকাকে বৈধব্য যন্ত্রণা সহিতে হয়! এই সকল হতভাগিনীদিগের মত দুর্ভাগ্য জীব এ বিশ্বসংসারে অতি অল্পই আছে। কিন্তু হিন্দুআর্য্যগণ এরকম বালিকা বিধবাদিগকে চিরকাল "বিধবা" থাকিতে বলেন নাই; পুনঃ সংস্কারের আদেশ দিয়াছেন। শাস্ত্রে ব্যবস্থা থাকিলেও ভারত সমাজ, দেশাচারের অনুরোধে, কুল-গৌরব বৃদ্ধির জন্য অপোগণ্ড বিধবাদিগকে "পতিপ্রাণা সতী" দেখিতে চাহে!—অস্বাভাবিক হইলেও ইহার অন্যথা সহিতে পারে না। গত শতাব্দীর তৃতীয় যুগে বঙ্গদেশে কোন কোন মাতা পিতা এইরূপ হতভাগিনী সন্তানের দুরবস্থায় একান্ত ব্যথিত হইয়া, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের নিকটে "বিধবা বিবাহের বিধি আছে কিনা" জানিতে চাহেন। হিন্দু পণ্ডিতগণও বিধবা বিবাহ "শাস্ত্রসম্মত" বলিয়া ব্যবস্থা দেন। কিন্তু বাঙ্গালির মধ্যে এমন সাহসী ব্যক্তি কেহ দেখা গেল না যে বিধবা বিবাহ সমাজে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা বুঝিয়া, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত—একথা জানিয়া কতক স্বার্থ-পরতায়, কতক দেশাচার-ভয়ে বিধবা বিবাহ সমাজে গ্রহণ করিতে কেহই অগ্রসর হইলেন না। বরং যে সকল পণ্ডিত বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, আন্দোলনের সময়ে তাঁহারাই "বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয়" বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন *।

* বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বেতন গবর্ণমেণ্টই দিয়া থাকেন। ইহা কম দয়া নহে।

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম বারের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪২৯ পরীক্ষার্থীর মধ্যে বি এ পাসে ৩৫০ এবং অনরে ৯৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মেটিল্‌ডা কোহেন এক মাত্র উত্তীর্ণা এবং ইংরাজী ২য় বিভাগে ৪র্থ স্থানীয়া হইয়াছেন। এফ এ পরীক্ষায় ১২৮৮ উত্তীর্ণ, তন্মধ্যে ৬১ জন ১ম, ৩২৪ জন ২য় এবং ৯০৩ জন ৩য় বিভাগস্থ। উত্তীর্ণা বালিকাদিগের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল। তিনটী প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ৯ম হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়।

নাম	কলেজ	বিভাগ
এল সি রোজ কলথার্ড	লোরেটো	১ম
এথেল গারট্রুড গাম্পার	ঐ	ঐ
সরলা সেন	বেথুন	ঐ
হেমলতা ঘোষ	ঐ	২য়
মিলিসেন্ট ফ্লোরেন্স সকমান	প্রাইবেট	২য়
মেরী এস্‌ ল	বেথুন	৩য়

২। চিত্রল অভিযানে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের জয় হইয়াছে।

৩। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী মূক বধির বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ আর এক বৎসরের জন্য মাসিক ১০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৪। চিন ও জাপানের মধ্যে সন্ধি প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে। কিন্তু জাপানের সৌভাগ্যে রুসিয়া উদ্‌বেজিত; ফরাসী ও জর্ম্মাণেরাও রুসিয়ার প্রতিবাদে যোগ দিয়াছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য জাপানের সপক্ষ। শেষ ফল কি দাঁড়ায়, বলা যায় না।

৫। গত বর্ষে নিম্ন বঙ্গে সর্প দংশনে প্রায় ১০,৮০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

৬। ইউরোপে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩৫ লক্ষ ৭০ হাজার অধিক।

৭। কাবুলের আমীরের পুত্র নস্রীরুল্লা তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ বিলাত যাইতেছেন। বোম্বাই হইতে জাহাজ ছাড়িয়াছে।

৮। কলিকাতায় জাপানের এক প্রতিনিধি থাকে, এজন্য একজন উচ্চপদস্থ জাপানী অনেকগুলি অনুচরসহ সিমলায় রাজ প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন।

৯। ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড রোজবেরী উৎকট পীড়াগ্রস্ত। তাঁহার পদত্যাগের সম্ভাবনা।

১০। ভিঙ্গার রাজার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র আত্মহত্যা করাতে রাজা আপনার রাজ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে দিয়া স্বয়ং কাশীবাস করিয়াছেন।

বামারচনা।

অবরোধে হীনাবস্থা।

আমাদের দেশে—আমাদের সমাজে স্ত্রীজাতির জন্য যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে, আমরা এ প্রথা ভাল বিবেচনা করি না। এই অবরোধ প্রথাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল; এই অবরোধ প্রথাই আমাদের হীনাবস্থার কারণ। আমরা পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় নিয়ত অবরোধরূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ রহিয়াছি, কাজেই আমাদের মনোবৃত্তি সকল ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের হৃদয় জ্ঞানালোকে প্রস্ফুটিত হইতে পারিতেছে না। সৎজ্ঞানলাভ করিতে না পারিলে জীবন উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। সৎজ্ঞান ব্যতীত দুর্ল্ভ মানবজীবন পশুর অপেক্ষাও হেয়ভাবে যাপন করিতে হয়। আমরা বাল্যকাল হইতে পিঞ্জরাবদ্ধ আমরা সৎজ্ঞান কোথায় পাইব? পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর প্রতি কৃপাপূর্ব্বক পিঞ্জরের নিকট আসিয়া যদি কেহ 'হরি' নাম শুনায়, তবেই সে শুনিতে পায়। কিন্তু হায়! কয়জন এমন সদাশয় ব্যক্তি আছেন, যে, এরূপে অনর্থক সময়ক্ষেপ করিবেন?

পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী ও আমরা উভয়েই সমশ্রেণীর তাহাতে সংশয় কি? যদি কোনও সহৃদয় মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক আমাদের ক্ষুদ্র জীবনকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হন, তাহাহইলে তাঁহার কুৎসা গাথায় দশ দিক্ পূর্ণ হয়, সুতরাং তিনি নিজ উদ্দেশ্য সাধনে বিরত হন। কাজেই আমাদের জীবন-পথে সৎজ্ঞানালোক নিপতিত হইতে পায় না। পাখী কি "হরি" নাম না শুনিয়া হরিগুণ গাহিতে পারে? হরি নাম গাহিবার জপ তাহাকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। আমাদিগকে শুধু অবরোধে রাখিলে আমাদের শিক্ষা হয় না। আমাদিগকে সৎজ্ঞান লাভের জন্য সমাজের শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। শিক্ষাতেই মানবহৃদয় গঠিত, শিক্ষা অভাবে মানবের কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। কুশিক্ষায় মানব অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়—হৃদয়হীন হইয়া পড়ে। সৎশিক্ষাতেই মানব-হৃদয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সৎশিক্ষা অভাবেই আমরা এত হীন হইয়া যাইতেছি এবং সেই জন্যই সমাজের চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু হায়! আমরা কিজন্য এত হীন হইয়া পড়িতেছি সমাজ যদি একবার তাহার অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আমরা সমাজের চক্ষুঃশূল হইয়া শত ব্যথা বুকে বহিয়া জীবন যাপন করিতাম না। যদি আমাদের প্রতি সমাজের এক বিন্দু কৃপাদৃষ্টি

থাকিত, তাহাহইলে আমরা আর্য্যবংশীয়া বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতাম, আমাদের জীবনও আর্য্য মহিলাদিগের ন্যায় পবিত্র ও উন্নত হইত। আর্য্য মহিলাদিগের জন্য অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না। তাঁহারা স্বইচ্ছায়—এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া অরাতি-মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতেন, তাঁহাদের এতদূর পর্য্যন্ত ক্ষমতা ছিল। তাঁহাদের শরীর যে রক্তমাংসে গঠিত, আমাদের শরীরও সেই রক্তমাংসে গঠিত, তবে তাঁহারা অধিক বলশালিনী ও অধিক ক্ষমতাপন্না ছিলেন কেন? আমরাই বা এত হীনবল কেন? ইহার একমাত্র কারণ সমাজ নয় কি? সমাজ তাঁহাদিগকে পালিত পক্ষীর ন্যায় অবরোধরূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই বলিয়াই তাঁহারা সৎজ্ঞান,সৎসাহস, সৎকীর্ত্তি লাভ করিতে সক্ষমা হইয়াছিলেন। আমাদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের জন্য যদি অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহাহইলে তাঁহাদের পবিত্র জীবনও আমাদিগের ন্যায় হীনাবস্থায় যাপন করিতে হইত। ভগিনীগণ! আইস, আমরা এ ভীষণ অবরোধ প্রথা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জীবনকে উন্নতি-পথে লইয়া যাইবার জন্য একান্তমনে পরম পিতা পরমেশ্বরকে ডাকি। তাঁহার কৃপায় আমরা নিশ্চয়ই এই হীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিব ও আমাদের জীবন প্রাচীন আর্য্য মহিলাদিগের ন্যায় বরণীয় ও আদরণীয় হইবে।

শ্রীনগেন্দ্রবালা মুস্তোফী। হুগলী।

হেঁয়ালি। *

মহাদেব শিরোদেশে বসতি আমার ;
কুসুমের পদতলে, থাকি আমি কুতূহলে,
আসামে আমার বাস, বামে থাকি বারমাস ;
মনের ভিতরে থাকি বিদিত সংসারে ;
দাঁড়াইয়া থাকি পুনঃ মরণের শিরে।
মদন আমার ডরে, মাথা ধরে দেহপরে,
সরমের পদে আমি বাঁধা অনুক্ষণ।
চেষ্টা কর পাবে ফল মনের মতন।

উপদেশ।

বিনয়! বিনয় গুণে হও গুণবান,
ঈশ্বর তোমার বাছা, করুন কল্যাণ।
দেশ-হিতকর ব্রত করহ গ্রহণ,
ঈশ্বরের প্রিয় কাজ করহ সাধন।
অবশ্য অথবা কোন তুচ্ছ প্রলোভনে,
ভুলিওনা, ভুলিওনা, পতিতপাবনে।
যিনি দিয়েছেন বাছা, জ্ঞান প্রাণ মন,
যিনি দিয়েছেন বাছা, সুখ অগণন,
ভুলিওনা তাঁরে, তাঁর সন্তোষ কারণ
পরের মঙ্গল সাধ করি প্রাণপণ।
প্রথম সন্তান বাছা তুমিরে আমার,
দিন দিন বয়োবৃদ্ধি হতেছে তোমার,
রেখেছি বিনয় নাম করিয়ে যতন
বিনয়ে ভূষিত হও বিনয়ভূষণ!!

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

---

* গত ফাল্গুন মাসের প্রকাশিত হেঁয়ালির উত্তর। "কলম" অনেক পাঠিকা লিখিয়াছেন। ঠিক হইয়াছে। বা, বো, স।

প্রভাতী।

মিশ্র কাফি—একতালা।

সোণার স্থমেরু-শিরে
    দুয়ার খুলিয়া যায়,
এখনি জাগিয়া উষা,
পরিছে রতন ভূষা,
পড়িছে রূপের ছটা,
    আঁধার জগত-গা'য়!
প্রকৃতির ঘুম ভাঙা,
নয়ন অলস, রাঙা,
মল্লিকা ফুলের মত
    হাসিটী ভাসিছে তা'য়! ১

অবনী তৃষিত প্রাণে,
চাহিছে আকাশ পানে,
এখনো আসেনি যেন,
    সে যারে দেখিতে চায়! ২

বিদায় মাগিয়া রাকা,
(চাঁদনী, শিশির-মাখা)
শিথিল আঁচল টেনে,
    ধীরে ধীরে স'রে যায়! ৩

বিহগ বিহগী তা'রা,
দিতেছে মধুর সাড়া,
কে যেন ভাঙিছে ঘুম,
    ডাকিছে "বাহিরে আয়!" ৪

সোণামুখী দিক্‌ বালা,
ছিঁড়িয়া মুকুতামালা,
ছড়ায়ে ফেলিছে হেসে,
    বসুধা সখীর গায়! ৫

শিশির নীরব ঘরে,
পুনঃ কোলাহল ভরে,
পুনঃ সে অমিয় ব'য়ে
    বাতাস, দিগন্তে যায়! ৬

আবার গোলাপ, জাতি,
বিকাসি রূপের ভাতি,
আদরে আতর ঢেলে,
    মাথাইছে মলয়ায়! ৭

জাগিল নরের মনে,
সংসার-সুহৃদ জনে,
ভকতি, মমতা, স্নেহ,
    পুনঃ বুকে উথলায়! ৮

নমো, প্রভো ভগবান!
আমারো এ নব প্রাণ,
সজীব, পবিত্র কর,
    তোমারি চরণ-ছায়; ৯

তোমারি আশীষে, হরি!
তব সেবা যেন করি,
আজিকার যত বাধা,
    সবি যেন দলি পা'য়; ১০

সংসারে যে অগণন,
নীচতার প্রলোভন,
দেখিও, এ দাসে তা'রা,
    যেন না ছুঁইতে পা'য়! ১১

এ ক্ষুদ্র জীবন মম,
স্ফুট সূর্য্যমুখী সম,
তোমা পানে চেয়ে চেয়ে,
    যেন গো শুকায়ে যায়। ১২

কিসের ভাবনা মম,
    তুমি রেখ পদ ছা'য়,
সারাটি জীবন মোর,
    ঢেলে দি' অভয় পা'য়! ১৩

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৫ সংখ্যা।	জ্যৈষ্ঠ ১৩০২—জুন ১৮৯৫।	৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ছোটলাট-পত্নীর ছবি—ইহার জন্য ৮০০০ টাকা চাদা উঠিয়াছে। কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে ইহার কতক টাকা ব্যয় হইলে কি ভাল হইত না? বিনা চিত্রে লেডী ডফরিণের কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইয়াছে।

দুই রাণীর সম্ভাষণ—মহীশূরের বিধবা রাজ্ঞী উৎকামুণ্ডে আছেন। বরদার মহারাণী সমবেদনা প্রকাশার্থ সেখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

চীন-জাপান সন্ধি—গত ৯ই মে চীন সম্রাট সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। রুসিয়া, ফ্রান্স, জার্ম্মণী প্রতিবাদী হওয়াতে জাপান লিওটং উপদ্বীপের দাবী পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অনেক টাকা লইয়াছেন।

চীনের সৌভাগ্য—চীনসাম্রাজ্যে ৪০ কোটী লোকের বাস, কিন্তু ১০০ জনের অধিক চিকিৎসক নাই। কলিকাতায় ৬ লক্ষ লোকের বাস; চিকিৎসকের সংখ্যা ৬ হাজারের অধিক হইবে; তথাপি রোগের আধিক্যই হইতেছে।

ক্ষুদ্রতম সাধারণতন্ত্র—সার্ডিনিয়া দ্বীপ হইতে ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী ট্যাভোলারা-নামক দ্বীপের পরিমাণ ২॥০ ক্রোশ মাত্র, এবং অধিবাসীর সংখ্যা ৫৫ জন। ১৮৮৬ সালে ইহা সাধারণতন্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছে; এখানে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রী-লোকদিগেরও রাজনৈতিক বিষয়ে মত দিবার অধিকার আছে। পিরানিস্ পর্ব্বতে গোঁষ্ট নামে এক স্বাধীন রাজ্য আছে; ইহার পরিমাণ এক ক্রোশও নহে, এবং অধিবাসীর সংখ্যা ১৩০ জন। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ

হইতে ইহা সাধারণতন্ত্ররূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল—এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৫ জন মহিলা উত্তীর্ণ হইয়াছেন ; তন্মধ্যে ১৩ জন ১ম বিভাগে, ১৯ জন ২য় বিভাগে এবং ১৩ জন ৩য় বিভাগে।

পৃথিবীর ওজন—বরজ নামে এক পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন পৃথিবীর ভার ৫,৮৩,২০,৬৪,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ টন।

কাগজের মোজা—জর্ম্মণিতে ইহা বহুল পরিমাণে চলিত হইয়াছে। ইহা পরিধান করিলে পায় ঠাণ্ডা লাগে না।

অন্নধ্বংস—ভগবানের প্রদত্ত যত অন্ন আমরা ধ্বংস করি, তাহার উপযুক্ত কাজ কি করি? এক পণ্ডিতের গণনায় সামান্য ক্ষুধাশীল লোক ৭০ বৎসরে প্রায় ১৩০০ মণ খাদ্য খায়; এ হিসাবে বৎসরে ২০ মণ এবং প্রতিদিন ২ সেরের কিছু অধিক হয়। কত লোক ইহার দ্বিগুণ চতুর্গুণ আহার করিয়া থাকে।

স্ত্রী এল, এল, ডি,—অদ্যাবধি ৩টি স্ত্রী-লোক L. L. D. এই উচ্চ উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহাদের নাম মেরিয়া সিরেল, এমিলিয়া এডওয়ার্ডস এবং ফ্রান্সেস উইলার্ড। ইহাঁদের মধ্যে প্রথমটি জ্যোতির্বিদ্যা-বিশারদ ও দ্বিতীয়টি মিসরের ইতিবৃত্তজ্ঞ।

স্ত্রী-স্বত্ব—আমেরিকা এত বড় সভ্য ও স্বাধীন দেশ, তথাপি সেখানে স্ত্রীলোককে কোনও কারবার খুলিলে স্বামীর নামে খুলিতে হয় এবং স্ত্রীলোক মজুরী করিয়াও যাহা উপার্জ্জন করে, তাহার অর্দ্ধাংশের উপর স্বামীর বৈধ অধিকার। এই ব্যবস্থা রহিত করিয়া স্ত্রীধনে স্ত্রীলোককে পূর্ণস্বত্ব দিবার জন্য কালিফোর্ণিয়ার ফ্রেসনো নামক নগরস্থ এক সভা হইতে এক আবেদন স্বাক্ষরিত হইতেছে।

বিগত শতবর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা।

বিধাতার কৃপায় বাঙ্গালাদেশে এমন দিনে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। দয়া, বদান্যতা, পরার্থপরতা, সৎসাহস, তেজস্বিতা, আত্মত্যাগ, বিদ্যা বুদ্ধিতে তিনি শীর্ষস্থানীয়। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বলিতেছি। বিধবা-বিবাহের জন্য এই পুরুষসিংহ সিংহ-বিক্রমে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিতেও স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। সামাজিক সংগ্রামে দেশের শত শত লোক এক দিকে, আর তিনি একা এক দিকে দাঁড়াইয়াছিলেন ; তথাপি তাঁহারই জয়লাভ হইয়াছিল। তাঁহার অলৌকিক শক্তিতে বিধবাবিবাহ

"শাস্ত্র-সিদ্ধ" বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই বঙ্গদেশে যিনি প্রথমে বিধবাবিবাহ করেন, বিধবাবিবাহের বিপক্ষেরা তাঁহাকে ও বিধবাবিবাহ-প্রচারক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে হত্যা করিতে গিয়াছিল, দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় সে দুরভিসন্ধি সফল হয় নাই। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে এই দুর্ঘটনা বাস্তবিক হইয়াছিল। বোম্বের ছোট আদালতের জজ্ মেরবা কেনবা সেখানে সর্ব্বাগ্রে বিধবাবিবাহ করেন। বিধবা-বিবাহের বিপক্ষগণ (উপায়ান্তর অভাবে) এক রাত্রিতে এই দম্পতীকে নিদ্রিতাবস্থায় কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনায় সে দেশে বিধবাবিবাহ রহিত হওয়া দূরে থাকুক, আরও প্রবল হইয়া উঠিল (১)।

বিধবা-বিবাহ প্রচার করিয়া, বহুবিবাহ নিবারণ জন্যও বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ আন্দোলন করেন। বহুবিবাহ নিবারণের সময়েও শাস্ত্রীয় বিচারে এ দেশের বড় বড় পণ্ডিতেরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে হারিয়া গিয়াছিলেন। বহুবিবাহ "অন্যায় ও অশাস্ত্র" বলিয়া রাজাও বুঝিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বহুবিবাহ নিবারক আইনের জন্য রাজদ্বারে প্রার্থী হইয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। অবশেষে, এ দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকে যাহাতে বহুবিবাহের অসভ্যতা ও অপকারিতা বুঝিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ ঘৃণিত প্রথা পরিত্যাগ করে, এই আশয়ে সুশিক্ষার বহুল প্রচারে একান্ত যত্নবান্ হন। শুনা যায় দেশের লোকের মধ্যে এইরূপ সুশিক্ষাবিস্তারই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজের (মেট্রপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশন) উৎপত্তির এক শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য। ফলতঃ স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি, বিধবা-বিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহ নিবারণ—হতভাগিনী ভারত-মহিলাদিগের জন্য এই সকল কাজ করিতেই যেন বিধাতা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলেন! বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে আধুনিক ভারত "ধন্যবাদের" যোগ্য হইয়াছে।

বর্ষার পরে যেমন শরৎ আইসে, শীতের পরে যেমন বসন্ত আইসে, ভারত-মহিলাদিগের বহু-শতাব্দীব্যাপী দুর্ভাগ্য-অন্ধকারের পরে সৌভাগ্য-চন্দ্রমা তেমনি ধীরে ধীরে ফুটিতেছিল। বিগত শতাব্দীর তৃতীয় যুগের শেষভাগে স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য অধিকতর আয়োজন হইতে লাগিল। আগে খ্রীষ্টান্-ধর্ম্ম-প্রচারকগণ স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য যে রকম চেষ্টা করিয়াছেন, এখন দেশীয় ব্রাহ্মগণ স্ত্রী-শিক্ষার জন্য সেই রকম চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজের নেতা মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন অসাধারণ-ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব, স্বদেশ-হিতৈষণা, উদারতা, বাগ্মিতা ও বিবিধ মহত্ত্বে

(১) মেরবা কেনবা সস্ত্রীক নিহত হইলে, পর বৎসরেই সেখানকার প্রধান বণিক্ মাধব দাস রঘুনাথ বিধবাবিবাহ করেন। ইহাতে বিপক্ষগণ পরাজিত হইয়াছিল।

বহু মানব মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। অনেকেই কেশবচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ না করিলেন, তাঁহারাও কুসংস্কার ও অসত্য পরিত্যাগ করিয়া সত্য, নীতি ও বিশ্বজনীন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ধর্ম্মাচার্য্য কেশব চন্দ্র নারীকুলের একজন পরম হিতৈষী ছিলেন। যাহাতে স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, আচার, ব্যবহার উন্নত হয়, যাহাতে স্ত্রীজাতি পরাধীনতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ঈশ্বরের অধীনতায় আপনা-দিগকে চালিত করিতে পারে, যাহাতে বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিবারণ ও স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার হয়, স্বর্গীয় কেশব-চন্দ্র একান্ত যত্নে তাহাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতা-শক্তি ছিল; তাই তাঁহার উত্তেজনায় দেশের শত শত ব্যক্তি স্ত্রীজাতির দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য গৃহ-কর্ম্ম নহে, পুরুষের ন্যায় রমণী-জীবনেরও প্রধান উদ্দেশ্য সত্যধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া আত্মোন্নতি, পরোপকার, বিশ্বজগতের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য কাজ করা; এ কথা অনেক পুরুষই সত্য বলিয়া বুঝিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য প্রায় প্রতি পল্লিগ্রামে মহোৎসাহে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল। সহরে ধনী মহিলাদিগকে মেম সাহেব শিক্ষয়িত্রী দ্বারা ইংরাজিভাষা, উলের কাজ, সূচের কাজ, প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। শিক্ষিত যুবকেরা নিজ নিজ স্ত্রী, ভগিনী প্রভৃতিকে উল্কি, মিসি, বহুল পরিমাণে শাঁখা সিঁদুর ব্যবহার ও অন্যান্য কুরুচি পরিত্যাগ করিতে শিখাইতে লাগিলেন। পৌরাণিক ব্রতাদি অপেক্ষা সত্যধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া, আত্ম-সংযম অভ্যাস করিয়া জগতের হিতৈষণা শিক্ষা যে মানব-জীবনের উচ্চতর কর্ত্তব্য, এ কথা অনেক রমণীই শিখিতে পারিলেন। শিক্ষিত যুবকেরা বহুবিবাহ নিবারণ ও বাল্যবিবাহ পরি-ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্ত্রী-জাতির সুরুচি ও সভ্যতার সহিত অলঙ্কার ও পরিচ্ছদেরও উন্নতি হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যতঃ এই সকলের অনেক বিষয়ের "আদর্শ" স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মসমাজে অনেক বালিকা-বিধবার পুনঃ সংস্কার হইল। অনেক ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ, ভারতবাসিনীদিগের উন্নতির বিষয়ে যোগদান করিলেন।

এই সময়ে কলিকাতায় উন্নতিশীল ব্যক্তিগণ "ভারত-সংস্কার সভা" সংস্থাপন করিয়াছিলেন। দেশে সুনীতি ও সদ্ভাব প্রচার করা এই সভার এক প্রধান উদ্দেশ্য। এই সভার অন্তর্গত শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ে এ দেশের অনেক বালিকা উচ্চতর শিক্ষার সহিত গার্হস্থ্য, শিল্প ও সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা পাইতেছিলেন। প্যারী-চাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কয়েক-জন মহাত্মার লিখিত বাঙ্গালা পুস্তক হইতে

বঙ্গবাসিনীগণ মহোপকৃতা হইতেছিল। ইত্যগ্রে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির হস্তে বঙ্গভাষার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

এ যুগে ভারতের একজন বিদুষী রমণী ভারতের মুখোজ্জল করিয়াছিলেন। ইনি বৈদিক মহিলাগণের আসনে বসিবার যোগ্য। এই মহিলা মহীশূরের মহারাণী সীতাবিলাস সি, আই, ই। এই রমণীরত্ন কোনও প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই, নিজগুণেই দেবী-জীবন লাভ করিয়াছেন।*

বিগত শতাব্দীর তৃতীয় যুগের শেষ-ভাগে স্ত্রীজাতির উন্নতিকর একটি শুভ ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখন বালিকারা (বিশেষতঃ পল্লিগ্রাম-বাসিনীরা) অল্প বয়সেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিত। ঘরে বসিয়া পড়িতে পারে, নিজেদের উপযোগী সুশিক্ষা লাভ করিতে পারে, তখন সে রকম স্ত্রী-পাঠ্য সাময়িক পত্র একখানিও ছিল না। হিন্দুমহিলাদিগেরই কথা বলিতেছি।—ইহার ফল এই হইত যে, হয় তাহারা বিদ্যালয় পরিত্যাগের সহিত লেখা পড়া ছাড়িয়া দিত, নয় কুরুচিপূর্ণ অপাঠ্য গ্রন্থ পাঠ করিত। এই অভাব দূর করিবার জন্য বাঙ্গালার কয়জন নারী-হিতৈষী যুবক ১২৭০ সালে "বামাবোধিনী" মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। যাহাতে বামাগণ সকল প্রকার কুচর্চ্চা ও কু-অভ্যাস ছাড়িয়া উপযুক্তরূপে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতি উপার্জ্জন করিতে পারেন, জাতীয় সদ্গুণ সকল গ্রহণ করিতে পারেন, খগোল, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, প্রভৃতি শিক্ষার সহিত ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস, সতীত্ব, সরলতা, লজ্জা, নম্রতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, গুরুভক্তি, পতিপ্রেম, ভগ্নীভাব, সন্তান-স্নেহ, প্রভৃতি তাঁহাদের জাতীয় সদ্গুণ যাহাতে উপ-যুক্ত রূপে বিকাস পায়, যাহাতে তাঁহারা গার্হস্থ্য নীতি উপযুক্তরূপে শিক্ষা করিয়া গৃহকর্ম্মে পারদর্শিনী হইয়া সুমাতা, সুভার্য্যা ও সুকন্যা হইতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা সমাজে জাতীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, পুরুষের সহকারিণী-রূপে ধর্ম্ম ও পবিত্রতা বিকাসের সহায়তা করিতে পারেন, সেই সকল বিষয়ের সুশিক্ষা দিতেই বামাবোধিনী জন্মগ্রহণ করিলেন। বামাবোধিনী অন্তঃপুর-বাসিনীদিগের মধ্যে সেই সুশিক্ষা প্রচার করিতে লাগিলেন। আরও এই বামাবোধিনীতে বামারচনা প্রকাশের নিয়ম থাকাতে অনেক রমণী উৎসাহিত হইয়া পদ্য ও গদ্য রচনার অভ্যাস করিতে লাগিলেন। বামাবোধিনীর বামা-রচনা স্তম্ভে বঙ্গবাসিনীদিগের প্রথম লেখা প্রকাশিত হইতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন বামাবোধিনীর কর্তৃপক্ষগণ অন্তঃপুর পরীক্ষা ও পরীক্ষোত্তীর্ণা মহিলাগণকে পারিতোষিক প্রদান প্রথা প্রবর্ত্তন করাতে অনেক পাঠিকার শিক্ষানুরাগ স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। বামাবোধিনীর

* ১৩০০ সালের বামাবোধিনী, আষাঢ় মাস—সীতাবিলাসের জীবনী দেখ।

জন্মগ্রহণের কিছুদিন পরে ইহার প্রবন্ধ সকল সঙ্কলন করিয়া "নারীশিক্ষা" নামক দুইখানি স্ত্রী-পাঠ্য উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইল, তাহা হইতেও বঙ্গমহিলা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উপকৃতা হইলেন।

মঙ্গলময় বিধাতা, স্ত্রীজাতির এই সকল মঙ্গলকর ঘটনা সংঘটন করিয়া তৃতীয় যুগের পরিসমাপ্তি করিলেন।

ইহার পরে চতুর্থ যুগের প্রবর্ত্তন। করুণাময় ভগবানের কৃপায় প্রথম যুগে স্ত্রীজাতির উন্নতির যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, দ্বিতীয় যুগে যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তৃতীয় যুগে যাহার শাখা প্রশাখা হইয়া ফুল ফুটিয়াছিল, চতুর্থ যুগেই তাহার ফল ফলিবার কথা। এই ফল কি রকম ফলিল, তাহাই আমাদিগের আলোচ্য।

আমাদিগের পাঠক পাঠিকাগণ জানেন যে, এ যুগে স্ত্রী-শিক্ষার পথ বড়ই সুগম হইয়াছিল। সুতরাং ভারতবাসিনীদিগের শিক্ষাবিভাগে বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। ভারত-সংস্কার সভার অন্তর্গত শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ে কুমারী রাজলক্ষ্মী সেন, সৌদামিনী কাস্তগিরি, রাধারাণী লাহিড়ী প্রভৃতি ছাত্রীগণকে পরীক্ষার সময়ে পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিয়াছিলেন যে, "শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীরা যে রকম পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, এ রকম পারদর্শিতা একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীর পক্ষেও গৌরবের বিষয়!" বেথুন স্কুলের ছাত্রীগণও বিশেষ প্রশংসিতা হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পল্লিগ্রামস্থ বালিকা-বিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও পরিদর্শকগণও সন্তোষজনক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য অধিকতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বঙ্গভাষার উন্নতির সহিত এ দেশে স্ত্রী-পাঠ্য বহুতর পুস্তক প্রচারিত হইল। ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "ধাত্রীশিক্ষা", ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "মাতৃশিক্ষা", বাবু শিবচন্দ্র দেব "শিশু-পালন" প্রকাশ করিয়া দেশীয় স্ত্রীজাতিকে যার পর নাই উপকৃতা করিলেন। সূতিকা-গৃহ, প্রসূতীর শুশ্রূষা, শিশুপালন, ও ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ে অনেক মহিলা অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

ধর্ম্ম বিষয়ে ভারতবর্ষে বড়ই মতভেদ দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ পরস্পরের ধর্ম্মমতে অশ্রদ্ধা করেন, এমন ঘটনা ভারতবর্ষে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের রাজা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, দেশের লোকেরা পরস্পর বিপরীতধর্ম্মাবলম্বী, এই জন্য (পারিবারিক ভাবে ব্যতীত) জাতীয় ভাবে এ দেশে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। বিগত শতাব্দীর চতুর্থ যুগে দেশের ও বিদেশের কয়েক মহাত্মা আর্য্য ঋষিগণের ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ রত্নাকর হইতে অনেক অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকটে প্রকাশ করেন। পূর্ব্বে মহাত্মা রামমোহন রায়, পরবর্ত্তী সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এই কার্য্য করেন।

যাহা হউক চতুর্থ যুগে এই সকল অমূল্য রত্নের লোভে ভারতের বহুলোক হিন্দুশাস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আমাদের দেশের একজন মহাত্মা বলিয়াছেন যে, "প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যাহা হিন্দুর সার ধর্ম্ম, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম"। এই অনুসন্ধিৎসার ফলেও এই মহাবাক্য অনেকটা সফল হইল। আর্য্য-ধর্ম্মের ভিতরে যে সকল উপধর্ম্ম ঢুকিয়াছিল, শিক্ষিত সমাজে তাহার অনেকগুলি পরিত্যক্ত হইল। সত্য, সরলতা, বিনয়, পবিত্রতা, আত্মসংযম, আত্মসংগঠন, পরোপকার, পর-হিতৈষণা যে মনুষ্য-জীবনের উচ্চতম কর্ত্তব্য, এ কথা অনেকেই বুঝিতে পারিলেন। সত্য ও নীতির অনেক অংশই প্রায় সকল সমাজে গৃহীত হইল। এইরূপ আন্দোলনে ভারত-বাসিনীদিগের অনেকে সত্যধর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিতে সক্ষমা হইলেন।

এই যুগের মধ্য সময়ে (১৮৮০ খ্রীঃ অব্দ) বেথুন কলেজের সুযোগ্য ছাত্রী কুমারী চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী বসুজাদ্বয় উচ্চতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে বেথুন স্কুল "কলেজে" পরিণত হয়। কলিকাতায় ব্রাহ্মস্কুল ও ভিক্টোরিয়া কলেজনামক আরও দুইটী বিদ্যালয়ে রমণীগণকে শিল্প, সঙ্গীত, গার্হস্থ্য শিক্ষা দিবার রীতিও প্রবর্ত্তিত হয়। এতদ্ভিন্ন কলিকাতায় খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের সংস্থাপিত কয়টী স্ত্রী-বিদ্যালয়ে এবং বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রী-বিদ্যালয়ে রমণীগণের শিক্ষাকার্য্য সংসাধিত হয়।

বঙ্গবাসিনীদিগের মধ্যে কুমারী রাধা-রাণী লাহিড়ী, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী গ্রন্থকর্ত্রী, শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী, অন্নদায়িনী সরকার প্রভৃতি সুলেখিকা আখ্যা পান।

এ যুগে ভারতবর্ষে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষকুমার দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্রজমোহন দত্ত, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভী নৌরজী, মালাবারি * ইত্যাদি বহু মহাত্মা নারী-হিতৈষণা-ব্রত গ্রহণ করেন। নারী-হিতৈষীদিগের মধ্যে অনেক প্রধান ব্যক্তির নাম এ প্রবন্ধে অপ্রকাশিত থাকিলেও ভারতরমণীর জাতীয় ইতিহাসে তাঁহারা অমৃতাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিবেন।

এখন সুশিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে সকলেই প্রায় বহুবিবাহ পরিত্যাগ করিলেন। বিধবাবিবাহ ব্রাহ্মসমাজে খুবই প্রচলিত হইল; হিন্দু সমাজে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত না হইলেও অনেক হিন্দু যুবক বিধবাবিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শিশু-বিবাহ প্রায় উঠিয়া গেল; বাল্য বিবাহসম্বন্ধে হিন্দু সমাজে বিশেষ আন্দোলন চলিল। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি ও চিকিৎসকগণ বাল্যবিবাহ বিশেষ অপকারী বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

* মালাবারি একজন বিখ্যাত নারী-হিতৈষী; কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় সেরূপ উদারচেতা ব্যক্তিরও বহু মত ভ্রমসঙ্কুল।

এ দেশে পুরুষ জাতির মধ্যেই চিকিৎসা-বিদ্যা প্রচলিত; ইহাতে রমণীগণের অনেক অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূর করিতে গবর্ণমেণ্ট এ দেশে ধাত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহাতে বহু রমণী ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বদেশীয়া মহিলাগণের মহোপকার সাধন করেন।

কিন্তু কেবল ধাত্রীর অভাব পূর্ণ হওয়া এ দেশের রমণীগণের পক্ষে "যথেষ্ট" হইল না। স্ত্রী জাতি স্বজাতীয়া চিকিৎসক অভাবে অনেক পীড়ায় কষ্ট পায়। ভারতের কোনও সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা ঐরূপ পীড়ায় বড় ক্লেশ পাইয়াছিলেন, পরে সুনিপুণা জনৈক ইয়োরোপীয় মহিলা (চিকিৎসক) কর্তৃক চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করেন। উক্ত চিকিৎসক মহিলা দেশে ফিরিয়া যাইবার সময়ে সেই সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহাকে বলিয়া দেন "মেয়ে ডাক্তার অভাবে ভারতবাসিনীদিগকে কি ক্লেশ পাইতে হয়, তাহা আপনি স্বচক্ষে দেখিয়া গেলেন; এ কথা ভারত-সাম্রাজ্ঞীকে অবশ্য অবশ্য বলিবেন।" ইউরোপীয় মহিলা স্বদেশে গিয়া ভারতেশ্বরীর নিকটে সেই কথা প্রকাশ করেন; ইহাতে করুণাময়ী ভারতেশ্বরী দয়ার্দ্রা হইয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যা প্রচলন সঙ্কল্প করেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন গবর্ণর জেনারাল লর্ড ডফরিণের সহধর্ম্মিণী লেডী ডফরিণের উপরে এই কার্য্যের ভার অর্পিত হয়। ১২৯৫ সালে লেডী ডফরিণ এ দেশের রমণীগণের জন্য স্ত্রীজাতির চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবার সময়ে ভারতবর্ষের প্রায় ৭ হাজার রমণী তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া অভিনন্দনপত্র লেখেন। যাহা হউক, এই বিদ্যালয়ে অনেক মহিলা যোগ্যতার সহিত শিক্ষা করিতেছেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন চিকিৎসকও হইয়াছেন।

এ যুগে ভারতের দুইটি মহারাষ্ট্রীয় মহিলা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন। এক, পণ্ডিতা রমা বাই সরস্বতী; এই বিদুষী মহিলার বিদ্যাবত্তায় এ দেশের বলিয়া নহে, জগতের রমণীগণ গৌরবান্বিতা হইতে পারেন। ইনি স্বজাতীয় ভগিনীদিগের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। অপর, আনন্দী বাই যোশী, এম্, ডি; এই মহাপ্রাণা রমণীও যেরূপ বিদ্যাবতী, সেইরূপ উচ্চাশয়া ছিলেন। বড় দুঃখের বিষয়, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ না করিতেই এই রমণী-রত্ন মানবলীলা সংবরণ করেন। ইনি যেরূপ মহাপ্রাণা ছিলেন, তাহাতে ভারত মহিলাগণ ইহাঁর নিকট হইতে অনেক উপকৃত হইতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

"স্বভাব যায় ম'লে।"

সাপ যখন বাঁচিয়া থাকে, কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে, চলিবার সময়ও বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলে। কিন্তু সেই সাপ যখন মরিয়া যায়, তখন সটান সোজা হইয়া পড়িয়া থাকে, সে যেন আর পূর্ব্বের সে জন্তু নয়। সাপের স্বভাবের বক্রতা মৃত্যুতে দূর হয়। মানুষের স্বভাবের মধ্যে যে কুটিলতা থাকে, তাহাও সহজে দূর হয় না। যতদিন মানুষ বাঁচিয়া থাকে, কার্য্য করে, তাহার স্বভাবের পরিচয় কোন না কোনরূপে পাওয়া যায়। কত সময় দেখা যায়, কু-স্বভাব ব্যক্তিকে সৎসঙ্গে রাখ, সদুপদেশ দেও, সৎকার্য্যে অভ্যস্ত কর, তথাপি অবসর পাইলেই সে আপনার খলতার পরিচয় দিবে। চৌর্য্যস্বভাবের লোক সন্ন্যাসী হইয়াও "ভুষনাড়া রোগ" ছাড়িতে পারে না; ক্রোধন স্বভাবের লোক বিবাদী ব্যক্তি না পাইলেও বাতাসের সহিত যুদ্ধ করে; আর নিন্দুক স্বভাবের লোক পরম সাধুদিগের মধ্যে থাকিয়াও মক্ষিকার ন্যায় ক্ষতস্থান অন্বেষণ করে এবং গুণকেও দোষ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। এই জন্য স্ত্রী-কবি যে বলিয়াছেন "যার যে রীত, না ছাড়ে কদাচিৎ", ইহা বহুদর্শিতার কথা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু উপরে যে স্ত্রী-কবি-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ কি? সাপ যেমন মরিয়া গেলে তাহার বক্র স্বভাব ছাড়িয়া সরল হয়, মনুষ্য মরিয়া কি সেইরূপ কুস্বভাব ছাড়িয়া সৎস্বভাব হইবে? মরিলে অসৎ লোক সৎ হয় কি না কে জানে? তবে অবশ্য সমাজের কণ্টক হইয়া সে আর কোনও পীড়ন করিতে পারে না। কিন্তু লোককে মরিতে বলা রাগ ও দুঃখের কথা, মরিলে যে স্বভাব বদলাইয়া যায়, তাহার প্রমাণ কি? অনুধাবন করিলে এই বচনের মধ্য হইতে গূঢ় সত্য আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাই গ্রহণ করিতে পারিলে প্রকৃত উপকার লাভ হয়। মানুষ মৃত্যুকালেত মরিয়া থাকে, 'জীয়ন্তে মরা' আর এক প্রকার মৃত্যু আছে। এই মৃত্যুতে মানুষের দেহ মরে না, কিন্তু আত্মার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া স্বভাব বদলাইয়া যায়। ধর্ম্মজগতের ইতি-হাসে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। নরঘাতক দস্যু রত্নাকর বিশ্বপ্রেমিক বাল্মীকি হইয়াছেন, দুরন্ত জগাই মাধাই মানুষের পায়ের ধূলি হইয়া বিনয়গুণের পরিচয় দিয়াছেন, অহল্যা পাষাণী আবার মানবী হইয়াছেন এবং খৃষ্টদ্বেষী পল খ্রীষ্টানু-রাগী সেণ্টপল হইয়া মহোৎসাহে তাঁহারই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। যে মৃত্যুতে এইরূপ কুস্বভাব বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা যে কি, কে বলিবে? ইহা ঈশ্বরের কৃপাপ্রদত্ত সুমতি। এই সুমতির উদয় হইলে মানুষ পাপকে ভয়ঙ্কর সর্পের ন্যায় ভয় করে, ঘৃণা করে ও দূরে পরিহার করে। কত

অনুতাপ, কত ক্রন্দন হৃদয়কে থাক করিয়া ধৌত করিয়া দেয়। ইহাতেই পুরাতন জীবন গিয়া নব জীবন লাভ হয়, পুরাতন স্বভাব বিনষ্ট হইয়া নূতন স্বভাবের উৎপত্তি হয়। এই মৃত্যু বৈরাগ্যের মৃত্যু। এই মৃত্যু না হইলে কেহ কুটিল স্বভাব ছাড়িয়া সরল হইতে পারে না, সংসারমায়া ছাড়িয়া ভগবৎ-প্রীতি লাভ করিতে পারে না এবং পাপময় অসার জীবন বিসর্জ্জন করিয়া পুণ্য জীবনের অধিকারী হইতে পারে না। জলন্ত বৈরাগ্যানলে কু-বাসনা দগ্ধ হইলে মানবপ্রকৃতি কুভাব ছাড়িয়া সুভাবে নূতনরূপে সংগঠিত হয়। এই বৈরাগ্যের জীবন্ত মৃত্যুই প্রার্থনীয়।

কৃষিবিষয়ক নানা কথা।

ধান্য।

ধান্যের চাষ আবাদ অতি সাধারণ ব্যাপার। উহার কিছু না কিছু সকলেই অবগত আছেন, এইজন্য উহার চাষ আবাদ প্রায় কোন কৃষিপুস্তকে লিপিবদ্ধ দৃষ্ট হয় না। পণ্ডিত কালীময় ঘটক প্রণীত "কৃষিশিক্ষায়" ধান্য প্রবন্ধটী অতি সুন্দর ও বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে। তৎপাঠে ধান্য সম্বন্ধীয় সকল কথাই শিখিলাম বলিয়া বোধ হইলেও উহাতে আরও কিছু থাকা উচিত ছিল এবং তাহা থাকিলে ঐ প্রবন্ধটীকে ধান্যবিষয়ক অদ্বিতীয় প্রবন্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতাম। বাবু হারাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "কৃষিতত্ত্ব" নামক পুস্তকেও ধান্য প্রবন্ধ আছে। আমাদের বিবেচনায় তাহাও আংশিক অপূর্ণ। জিঃ সিঃ বসু সম্পাদিত "কৃষি গেজেটে"ও ধান্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু তাহার কোন স্থানেই তদ্বিষয়ক একটী সম্পূর্ণ প্রবন্ধ নাই। কিন্তু ধান্য এ দেশের সর্ব্বপ্রধান ফসল, তাহার সকল কথা জানিতে সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। এই জন্য আমরা বামাবোধিনীতে ধান্যবিষয়ক একটী সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন প্রবন্ধ লিখিবার চেষ্টা করিব।

ভূমি। কোন্ প্রকার ভূমিতে কোন্ প্রকার ধান্য উত্তমরূপে জন্মিতে পারে, অগ্রে তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক। তাহা না করিয়া যেখানে সেখানে ধানের আবাদ করিলে, ধান না হয়, এমন নহে, কিন্তু কৃষক লাভবান্ হইতে পারেন না। ধান্যের প্রকারভেদ অনুসারে ধান্য জন্মিবার ভূমিও বহুবিধ। ধান্য সামান্যতঃ ত্রিবিধ; আশু, হৈমন্তিক ও ঝাটি। এই ত্রিবিধ ধান্যের ভূমি, আকৃতি, প্রকৃতি, উৎপত্তির নিয়ম ও চাষ আবাদ সকলই পৃথক্ পৃথক্। আমরা ক্রমশঃ ঐ গুলি বিবৃত করিব। কোন্ প্রকার ধান্য কোন্ প্রকার ভূমিতে

জন্মে, তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ভূমির এবং মৃত্তিকার প্রকারভেদ জানা আবশ্যক, নতুবা ধান্যের জন্য ভূমি নির্ব্বাচনের সুবিধা হইবে না।

পৃথিবীতে যত স্থলভাগ আছে, তাহাদের সাধারণ নাম ভূমি। আকৃতির অসমতা নিবন্ধন তাহারা পর্ব্বত, অধিত্যকা, উপত্যকা, শৈলতল, সমভূমি, নদীমুখ, মরুভূমি, ও তৃণভূমি ইত্যাদি বিবিধ নাম ধারণ করিয়াছে। এই সকল প্রকার ভূমিই স্থূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি। আকৃতি প্রকৃতির ভিন্নতা বশতঃ ঐ দ্বিবিধ ভূমিরও বহুতর অবান্তর ভেদ আছে, তাহাকে ক্ষেত্রভেদ কহে। ধান্যের ভূমি নির্ব্বাচন জন্য এই ক্ষেত্রভেদ জানা আবশ্যক। ক্ষেত্রভেদ পাঁচ প্রকার:—১—কূর্ম্মপৃষ্ঠ; ২—ক্রমনিম্ন; ৩—সমভূমি; ৪—কুড়ি; ৫—বিলান। ইহাদিগকে যথাক্রমে শিষেটান, আড়গড়ানে, একতলা, জোল ও বিল কহিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই সকল বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। কৃষি-শিক্ষায় অন্য প্রকার নামের উল্লেখ আছে। ঐ পঞ্চবিধ ক্ষেত্রের প্রথম তিন প্রকারকে ডাঙ্গা ও শেষ দুই প্রকারকে ডহর কহে। এই পাঁচ প্রকার ভূমির লক্ষণ, উহাদিগের নামশ্রবণমাত্রেই উপলব্ধ হইতেছে, এজন্য তাহার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক বোধ হইল। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে, কূর্ম্মপৃষ্ঠ ও ক্রমনিম্ন এই দ্বিবিধ ভূমি অতি নিকৃষ্ট, কেননা উহাদিগের গাত্রে রস দাঁড়ায় না। তদুপরি বৃষ্টিপাত হইবামাত্র বৃষ্টির জল, কূর্ম্মপৃষ্ঠের চতুর্দ্দিকে ও ক্রমনিম্নের নিম্নদিকে গড়াইয়া যায়। কূর্ম্মপৃষ্ঠ ভূমিতে পান ভিন্ন অন্য ফসলের আবাদ প্রায় হয় না। তবে বিলের মধ্যে যে কূর্ম্মপৃষ্ঠ বা শিষেটান ক্ষেত্র থাকে, তাহাতে ধান্যাদির আবাদ হইতে পারে। এইরূপ বিলের মধ্যগত আড়গড়ানে ক্ষেত্রও কথঞ্চিৎ উর্ব্বর হইয়া থাকে। সমভূমি, কুড়ী ও বিলান এই ত্রিবিধ ভূমিই উর্ব্বরা ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী হইয়া থাকে; কারণ চতুষ্পার্শ্বস্থ বর্ষাবারি ঐ স্থানে আসিয়া সঞ্চিত হয় এবং পলি নিক্ষেপপূর্ব্বক উহাদিগকে উর্ব্বর করিয়া তুলে। অবস্থানুসারে কুড়ী জমির জোল, কাইচোল, কোলকুড়ী ও কোলদোপ্ এই চারি প্রকার নাম হইয়া থাকে। ঐ সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার শালী বা হৈমন্তিক ধান্য উত্তমরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিল কাহাকে কহে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কোন কোন বিলে নদীর জল আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না, বর্ষাকালে বৃষ্টিবারি দ্বারা উহা পরিপূর্ণ হয় এবং বর্ষান্তে শুষ্ক হইয়া যায়। কোন কোন বিলের সহিত বড় বড় স্রোতস্বতী নদীর যোগ থাকায় বর্ষাকালে ভূরিপরিমিত পলির সহিত নদীর জলে পূর্ণ হয় এবং বর্ষান্তে তাহার সমুদায় বা অধিকাংশ নির্গত হইয়া "বিলকাঁদুড়ে" বা "চাতাল" ক্ষেত্রকে বিলক্ষণ উর্ব্বর করে। বিলের অন্তর্গত অপেক্ষাকৃত নিম্ন ক্ষেত্রকে

"বিলকাঁছড়ে" বা "চাতাল" কহিয়া থাকে। এই সকল জমিতেও সর্ব্বপ্রকার হৈমন্তিক ধান্য জন্মিয়া থাকে। তবে ভূমির উচ্চতা, নিম্নতাদি অবস্থানুসারে বিশেষ বিশেষ গুণশালী হৈমন্তিকের আবাদ করিতে হয়। আমরা সে কথা বিশেষরূপে পরে বলিব। কোন কোন বিলের মধ্যস্থলে গভীরতার শেষ সীমা, এবং কোন কোন বিলের এক পার্শ্বে শেষ সীমা দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানকে "রুই" কহে। বিলের মধ্যে যে যে স্থলে জলের গভীরতা শেষ হয়, সেই সেই স্থলের জল প্রায় বারমাসই থাকে এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে অনেক দূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকা পঙ্কিল হইয়া থাকে। ঐ পাঁকি জমিতে "বোরো" ধান, এবং ঐ পঙ্কিল ভূমিতে অল্প পরিমাণে জল থাকিলে তাহাতে "জলি" ধান হইতে পারে।

সাধারণতঃ আশু ধান্য উচ্চ ভূমিতে এবং হৈমন্তিক নিম্ন ভূমিতে জন্মিয়া থাকে। ঝাটিজাতীয় ধান্য বিলকাঁছড়ে বা চাতাল জমিতে বা কিঞ্চিদুন্নত কুড়ি জমিতে জন্মিয়া থাকে। কি প্রকৃতির ধান্য কোন্ প্রকার বিশেষ ক্ষেত্রে জন্মিয়া কি প্রকার ফল প্রসব করে, আমরা তাহা যথাস্থানে বলিবার চেষ্টা করিব।

মৃত্তিকা। যেমন মূল বর্ণ তিনটী, তেমনি মূল মৃত্তিকাও তিন প্রকার— মেট্যেল, পলি ও বালি। এই ত্রিবিধ মূল মৃত্তিকার সহিত অঙ্গার, চূর্ণ, উদ্ভিজ্জ ও জীবদেহাবশেষ, যবক্ষার, গন্ধকাদি ধাতব নানা প্রকার সারীয় বস্তু মিশ্রিত হইয়া নানা প্রকার মৃত্তিকার সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সকল মৃত্তিকার প্রকৃতি বুঝিতে পারিলে ধান্য আবাদের অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ এ প্রবন্ধে প্রদান করা ঘটিবে না, কারণ তাহার আলোচনা করিতে তড়িৎ-বিজ্ঞান ও তদন্তর্গত রসায়নশাস্ত্রের আংশিক আলোচনা আবশ্যক। তাহা করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। এজন্য মৃত্তিকার প্রকারভেদ খুব সংক্ষেপে বলিতে হইবে।

মূল ও মিশ্র উভয় মৃত্তিকা অনেক প্রকার; তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান:— মেট্যেল, হেড়মো মেট্যেল, ঘোব্‌কা মেটোল, দুধে মেট্যেল, চুণে মেটোল, রাঙ্গা-মাটী, ঝাঝরা মেট্যেল, পলিমাটী, কাসমাটী, পান্তামাটী, বেলেমাটী, লোণা সোয়ারা, লোণা কোটা, দো-আঁশ, ভিটামাটী ইত্যাদি। সর্ব্ব প্রকার মেট্যেলের সাধারণ নাম আটাল মৃত্তিকা। উহাতে জল লাগিলে চট্‌চটে আটা ও পিচ্ছিল হয়। এই মাটির ক্ষেত্রে প্রথম আবাদ করা অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু ঐ মাটী এক বার শিথিল ও সচ্ছিদ্র হইয়া গেলে তাহাতে সর্ব্ব প্রকার শস্য উত্তমরূপ জন্মিতে পারে। পচা বাদলা পাইলে ঐ মাটীর উৎপাদিকা শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক হইলে আটাল ক্ষেত্র কাঁকুড়ফাটা হইয়া যায়। রাঢ় অঞ্চলের ক্ষেত্র সকল প্রায়ই এই মৃত্তিকার। ঐ দেশের কোন কোন ভাগে বালুকা-যোগে মাটীকে বিশেষ উর্ব্বরা করিয়াছে

এবং কোন কোন ভাগে কাঁকর-সংযোগে মৃত্তিকার দোষ জন্মিয়াছে। মোটের উপর রাঢ়দেশীয় আটাল ক্ষেত্র সকল অতিশয় উর্ব্বর; এই জন্য ঐ দেশের ধান্য প্রশংসনীয়। বিশেষ বিশেষ বস্তু সহযোগে আটাল মৃত্তিকা বিশেষ বিশেষ গুণ প্রাপ্ত হয়। হেড়্মো মেট্যোলে বালুকা ও কঙ্কর নাই; উহাতে বহুকালের পচা ও শিলাখণ্ডবৎ কঠিন মৃত্তিকাভূত উদ্ভিজ্জাংশ দৃষ্ট হয়। এ জন্য ঐ মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ, তাপ-শোষক ও অতিশয় উর্ব্বরা। উহাতে ধান্যাদি প্রধান প্রধান শস্য উৎকৃষ্টরূপে জন্মিয়া থাকে। নদীয়া জিলার উত্তরে কালান্তর ও বনাজ প্রদেশ ঐ মাটীর আকর। ঐ মাটী একবার লাল, অর্থাৎ আবাদের যোগ্য হইয়া গেলে তাহার পর দুইবার মাত্র চাষেই সকল প্রকার ফসল উত্তমরূপে হইতে পারে। এই মাটী শুষ্ক হইলে প্রস্তরবৎ কঠিন ও বৃহৎ বৃহৎ ফাটলে পূর্ণ হয়। ধোবকা মেট্যোল অনেকাংশে হেড়মো মেট্যোলের ন্যায়, কিন্তু এই মাটীতে অধিক পরিমাণে চাষ না দিলে কোনও ফসল জন্মিতে পারে না। যে বর্ষে অতিবৃষ্টি হয়, সে বর্ষে এই মাটীর ক্ষেত্রে অধিক ফসল জন্মে। দুধে মেট্যোল সাদা, ঈষৎ আটাল, সচ্ছিদ্র ও কোমল। এই মাটী অন্যান্য মেট্যোল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অন্যান্য মেট্যোলে কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদ্ ভাল হয় না; কিন্তু দুধে মেট্যোলে না জন্মে এমন ফসল নাই। চূণে মেট্যোলের প্রকৃতি অন্যান্য মেট্যোল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ইহার বর্ণও নানাবিধ। স্থানবিশেষে শ্বেত, পীত, লোহিত বর্ণ দৃষ্ট হয়। এই মাটী শুষ্ক হইলে অসংখ্য ফাটলবিশিষ্ট হয়। ফাটল সকল প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র; কিন্তু এক একটা ফাটল অতিশয় দীর্ঘ ও গভীর। এই মাটী সমস্ত রাঢ়দেশ ব্যাপিয়া আছে। এই মাটীই ঘুটিঙ্গের আকর। ইহাতে অসংখ্য পরিমাণে ঘুটিং ও কাঁকর মিশ্রিত আছে; এমন কি, ঐ মাটীর এক তৃতীয়াংশ ঘুটিং কাঁকর ও চূণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ঐ মাটীর অবস্থা এরূপ হইলেও উহা অতিশয় উর্ব্বরা। উহাতে কাঁটাল, কদলী প্রভৃতি কয়েকটী উদ্ভিদ হইতে পারে না; কিন্তু তুঁত ও হৈমন্তিক ধান্য বিশিষ্টরূপে উৎপন্ন হয়। তবে এই মাটীতে প্রতি বৎসর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সার প্রদান করা আবশ্যক হয়।

মেট্যোল মাটীর মধ্যে যাহার বর্ণ রাঙ্গা, তাহাকে রাঙ্গামাটী কহে। ইহা উর্ব্বরা, ইহাতে নানাবিধ শস্য জন্মে। রাঢ়দেশের কোন কোন অংশে, ঢাকা জিলার সুবর্ণ গ্রাম ও বিক্রমপুর অঞ্চলে, হিমালয় পর্ব্বতের কোন কোন অংশে এবং কোন কোন নদীর গর্ভে ঐ মাটী দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাঙ্গামাটী দুই প্রকার। এক প্রকারের সহিত ঘুটিং ও কাঁকর মিশ্রিত থাকে, তাহা ঘুটীং ও কাঁকরের আকর। চূণ মেট্যোলের রূপান্তর মাত্র। আর এক প্রকারে ঘুটিং আদির গন্ধও নাই, তাহাই বিশুদ্ধ রাঙ্গামাটী। তাহাতে উত্তমরূপে কৃষিকার্য্য

নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। কুম্ভকারেরা হণ্ডিকাদি মৃণ্ময় পাত্রের গাত্রে যে বর্ণক নামক মাটীর পোঁচ দিয়া থাকে, যাহা দগ্ধ হইয়া গাঢ় লোহিতবর্ণ হয়, তাহা এই রাঙ্গামাটী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঝাঁঝরা মেট্যেল একটা পৃথক্ মাটী নহে। যে কোন প্রকার মেট্যোলে কিছু কিছু বালুকা মিশ্রণ থাকিলেই তাহাকে ঝাঁঝরা মেট্যোল কহে। সুতরাং মেট্যেল মাটীর যত প্রকার বর্ণ আছে, ঝাঁঝরা মেট্যোলের তৎসমুদায় বর্ণ হইতে পারে। মিশ্রিত বালুকার ন্যূনাধিক্যানুসারে ঝাঁঝরার উর্ব্বরতার তারতম্য হইয়া থাকে।

বর্ষাকালে নদী উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার জল পার্শ্ববর্ত্তী বিল, খাল, ও নামাল জমিতে প্রবেশ করে, কিম্বা বৃষ্টির জল উচ্চ স্থান হইতে গড়াইয়া নিম্ন স্থানে গিয়া সঞ্চিত হয়। ঐ সকল জল যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হয়, সেই স্থানের উপরিস্থ মৃত্তিকা ধৌত হইয়া বিল খালাদি নিম্ন ভূমির তলভাগে সঞ্চিত হয়, উপরকার জল শুষ্ক হইলে ঐ মৃত্তিকাও শুষ্ক হয়। ঐ মৃত্তিকাকে পলল বা পলিমাটী কহে। পলল দ্বিবিধ,—মাটীপলি ও বালিপলি। বালিপলি অপেক্ষা মাটীপলি অধিক উর্ব্বর। পলিমাটী একপ্রকার সারের মধ্যে পরিগণিত। উহার মিশ্রণে উষর মৃত্তিকাও উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয়। পলিতে আলু, কপি, কড়াইশুঁটী, পলাণ্ডু, ও বিবিধ শাক সব্জি উত্তমরূপ জন্মে। বিশেষতঃ বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ্ উহাতে সুন্দররূপে জন্মে। আম, কাঁটাল, নারিকেল, খর্জ্জুর, বাঁশ প্রভৃতি পলিমাটীতে ভাল হয়। তদ্ভিন্ন যে হৈমন্তিক ধান্যের ক্ষেত্রের মৃত্তিকা অতিশয় কঠিন, তাহাতে কতক পলিমাটী মিশাইতে পারিলে প্রচুর ধান জন্মে। পলি এতাদৃশ উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা হইলেও উহার একটা বিশেষ দোষ এই যে, পলল ক্ষেত্রে কোন ফসল জন্মাইতে হইলে উহাতে অধিক চাষ দিতে হয়; কারণ উর্ব্বরতা হেতু পলল ক্ষেত্রের তৃণাদি মারা অতিশয় কঠিন হয়। পুনঃ পুনঃ চাষ না দিলে ঐ তৃণাদি মরে না।

যে মাটি সর্ব্বদা সরস থাকে, তাহাকে পান্তামাটী কহে। উত্তাপ বিকিরণ-শক্তির আধিক্য বশতঃ মৃত্তিকার ঐরূপ প্রকৃতি হইয়া থাকে। রসপলি, পান্তা-মাটির নামান্তর। অতিবৃষ্টির বৎসরে ঐ মাটীতে ভাল ফসল হয় না। অতি-বৃষ্টি না হইলে ঐরূপ মৃত্তিকার ক্ষেত্রে বার মাস লাঙ্গল চালাইতে ও সময়োপযোগী ফসল করা যাইতে পারে।

যে মাটীর অধিকাংশ বালুকা, তাহাকে বেলেমাটী কহে। বেলেমাটী অনুর্ব্বরা মধ্যে গণ্য। তবে ইহাতে বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারে। যে সকল ওষধির ডাঁটা বা কাণ্ড কাষ্ঠশূন্য ও কাঁচা, তাহা ঐরূপ মাটীতে মন্দ হয় না; যেমন, পটোল, কাঁকুড়, তরমুজ ইত্যাদি। কুড়ী ক্ষেত্র, অর্থাৎ যাহার চতুষ্পার্শ্ব উচ্চ ও মধ্যস্থল নিম্ন, বালুকাময় হইলে তাহাতে ধান্যাদি জন্মিতে পারে। অতিবৃষ্টিতে

বালুকা-ভূমি এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; কারণ বায়ু, জলস্রোতাদি কারণে দীর্ঘকালে বালুকা-ভূমির উপর যে স্বল্প পরিমাণে পল সঞ্চিত হয়, অতিবৃষ্টি হইলে তাহা ধৌত হইয়া যাওয়ার তদুপরি আর কোন ফসলই হইতে পারে না। তবে অতিবৃষ্টিতে কুড়ী ক্ষেত্রের ঐরূপ অনিষ্ট না হইয়া বরং ইষ্টই হইয়া থাকে। কারণ চতুষ্পার্শ্বস্থ উচ্চ ভূমি অতিবৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া মধ্যস্থ বালুকা-ক্ষেত্রকে পল-আবৃত ও উর্ব্বর করে।

(ক্রমশঃ)

মাতৃহৃদয়।

(গত প্রকাশিতের পর)

(৩)

আমার ধ্রুব এখন পাঁচ ছয় বছরের হইয়াছে। তাহার অনেকগুলি খেলার সাথী জুটিয়াছে। ধ্রুব তাহাদিগকে পাইলে আর কিছুই চাহে না; তাই তাহারা আমারও বড় স্নেহের, বড় আদরের জিনিষ হইয়াছে। তাহাদের কাহারও গায়ে একটী মশা বসিলেও আমার যেন অসহ্য যন্ত্রণা হইতে থাকে। তাহারা ধ্রুবকে লইয়া খেলা করে, নাচে, গান করে; আমি ঘরে মুড়ি ভাজিয়া, বাতাসা কিনিয়া, তাহাদিগকে খাইতে দিই। তাহারা সকলেই আমাকে "মা" বলিয়া ডাকে। আমার মনে হয়, তাহারা আমার ধ্রুবের প্রতিকৃতি।

কিন্তু ধ্রুবকে কেবল খেলা করিতে দিয়াই আমি নিশ্চিন্ত নহি। তাহাকে আমি লেখা পড়াও শিখাইতেছি। এরই মধ্যে আমার ধ্রুব দুই তিন খানা পুস্তক পড়িয়া ফেলিয়াছে। হাতেও লিখিতে শিখিয়াছে। ধ্রুব এক এক খানা বই শেষ করে, আর আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হইতে থাকে! এখন ধ্রুবকে স্কুলে দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমার যে রকম অবস্থা, তাহাতে তাহাকে স্কুলে দিতে সাহস হয় না। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া, স্কুলের প্রধান অধ্যক্ষের নিকটে ধ্রুবকে লইয়া গেলাম। এতকাল আমার ধন, মান, খ্যাতি বা প্রতিপত্তির জন্য কোনও বড় লোকের দুয়ারে যাইতে প্রবৃত্তি হয় নাই, আজি ধ্রুবের জন্যই সে প্রবৃত্তি হইল। আমি এখনই বুঝিতে পারিতেছি পাঞ্চালেশ্বর দ্রুপদ রাজার কাছে, দ্রোণাচার্য্য অর্দ্ধরাজ্য কেন প্রার্থনা করিয়াছিলেন! আমি এখনই বুঝিতে পারি, ক্ষুধিতা কন্যাকে দেখিয়া, অটল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ কেন প্রতিজ্ঞা ভুলিয়াছিলেন—কেন আকবর সাহের শরণাপন্ন হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন! এ জগতে সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাতেই লোকে

অভিমান, আত্মসম্ভ্রম এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারে!

অধ্যক্ষ মহাশয় একজন সদাশয় মহৎ ব্যক্তি। তিনি ধ্রুবকে পরীক্ষা করিয়া, আমার অবস্থা শুনিয়া, আমার ধ্রুবকে বিনা বেতনে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। আমি এতদিন কৃতজ্ঞতার ধার বড় ধারিতাম না —আমি কাহারও কাছে উপকারের প্রত্যাশী ছিলাম না! যাহা হউক, স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয়ের এই অনুগ্রহ পাইয়া আমার প্রাণে কৃতজ্ঞতা-স্রোত উথলিয়া উঠিল। আমি তাঁহার কাছে বিক্রীত হইলাম।

এতদিন আমি সত্য সত্যই কাঙ্গালিনী ছিলাম; এখন ধ্রুবকে পাইয়া জগতের সব অমূল্য সম্পত্তি পাইলাম। ধ্রুবকে পাইয়াই আমি স্নেহ মমতা পাইলাম, পরার্থপরতা পাইলাম, ভক্তিকৃতজ্ঞতা পাইলাম, ত্যাগ-স্বীকার আত্মসংযম পাইলাম, অধিক কি বলিব, একমাত্র ধ্রুব হইতেই আমি সত্য সত্য "সামাজিক মানব" হইলাম। এ ঘন আঁধারে ধ্রুবই আমার ধ্রুবতারা! ধ্রুবই আমার মানবজন্মের সুখ, সুখে উৎসব! ধ্রুবই আমার সব।

(৪)

আমার সর্ব্বস্ব ধন ধ্রুব আজি ঘরে ফিরিয়া আসিল না কেন? সাথীদের সাথে খেলিতে গিয়াছিল, সমস্ত দিন বাড়ীতে ফিরিল না কেন? আমি "গোপাল-হারা" মা যশোদার মত ধ্রুবকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তাহার সাথীদের বাড়ীতে গেলাম, তাহারা কেহই বলিতে পারিল না! আমি পাগলিনীর মত অস্থির হইলাম—ধ্রুবের কত অমঙ্গলের ভাবনাই মনে আসিল! আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি হইল—এতক্ষণে হয়তো ধ্রুব ঘরে ফিরিয়াছে, এতক্ষণে হয়তো পেতে করিয়া মুড়ি খাইতেছে, এই আশায় ছুটিয়া ঘরে আসিলাম, দেখি সেই জনশূন্য স্থানে আমার জনশূন্য পর্ণ-কুটীর আরও শূন্যময় হইয়া রহিয়াছে। আমার ধ্রুবের চাঁদের মত মুখখানি সে আঁধার ঘর আলো করিয়া নাই! দেব-মন্দিরে দেবতা না থাকিলে তাহা যেমন শূন্যময় হয়, মানবদেহে প্রাণ না থাকিলে তাহা যেমন শূন্যময় হয়, আমার কুটীর ধ্রুবের অভাবে তেমনি শূন্যময়—তেমনি মহাশূন্যময় হইয়া আছে! আমি এ দৃশ্য দেখিতে পারিলাম না। মাটীতে পড়িয়া উচ্চ কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলাম।

মানুষের সুখ দুঃখে জড় প্রকৃতির আসে যায় কি? ধ্রুব আমার কোলে শুইয়া বুকের ভিতরে মুখ লুকাইয়া থাকিলে, প্রহরে প্রহরে রাত্রির যেমন প্রহর বাজিত, আজও সেই রকম বাজিল। রাত্রির পরে যেমন করিয়া চিরদিন প্রভাত আইসে, সেই রকম করিয়া প্রভাতও আসিল। আমি সারারাত্রি ধ্রুবকে খুঁজিয়াছিলাম, সকালেও খুঁজিতে লাগিলাম। যখন হতাশ হই, তখন মাটিতে পড়িয়া কাঁদি, যখন আশা বলে "এইবার ধ্রুবকে খুঁজিয়া দেখ, পাইবে" তখনই দ্বিগুণ উৎসাহে ইতস্ততঃ

ছুটিয়া বেড়াই। মাঠে রাখাল বালকেরা গরু চরাইতেছিল, কৃষকেরা চাষ করিতেছিল, আমার কাদামাখা দেহ, এলো চুল, রক্তিম চক্ষু প্রভৃতি দেখিয়া তাহারা "পাগল" বলিয়া হাসিতে লাগিল। তাহাতে আমার দুঃখও হইল না—রাগও হইল না! আমার আর কিছু দেখিবার বা শুনিবার শক্তি নাই! আমার ধ্রুব কোথায় গেল? আমার সংসার আঁধারের ধ্রুবতারা! মানব-হৃদয়ের আশা! জগতের বন্ধন! আমার ধ্রুব! তোর অভাগিনী মা'কে একবার দেখা দে' বাপ!

সমস্ত দিনের অসহ্য যাতনার প্রপীড়নে সন্ধ্যাকালে আমার মাথা কেমন করিতে লাগিল। আমি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া এক নদী-তটে পড়িয়া রহিলাম। * *

যখন চক্ষু মেলিলাম, তখন দেখি রাত্রি গভীরা। বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিলাম দুইখানি কোমল হস্ত আমার শুশ্রূষায় নিয়োজিত রহিয়াছে! আমার মনে স্মৃতি, কল্পনা, আশা সবই জাগিয়া উঠিল। তখন দুই হাতে চোক ঢাকিয়া বলিলাম "আমার ধ্রুব, আসিয়াছ কি?"

বড় মধুর স্বরে একজন উত্তর করিল "মা, আমি তোমার সন্তান!" এতো আমার ধ্রুব নয়!!

কণ্ঠ-স্বরে মানুষ চিনিলাম। আমার পিতৃতুল্য ভক্তিভাজন যোগনারায়ণ ঠাকুর। তিনি আমাকে কন্যার মত স্নেহ করেন; তাই তাঁহার কাছে আমার ব্যথিত হৃদয় সহানুভূতির ভিখারী হইল; আমি কাঁদিয়া কহিলাম "ঠাকুর, আমার ধ্রুব বাঁচিয়া আছে কি?"

সন্ন্যাসী যেন দৈববাণী শুনাইলেন, কহিলেন "ভয় কি, মা, তোমার ধ্রুব বাঁচিয়া আছে, ভাল আছে।"

আমার মৃতদেহে যেন অমৃত-বিন্দু পড়িল! তাঁহার পদতলে লুটিয়া বলিলাম "বাবা! আমাকে বাঁচাও, আমার ধ্রুব কোথায় আছে বলিয়া দাও।"

ধীরপ্রশান্তমুখে ঠাকুর কহিলেন "মা, ধ্রুব অনেক দূরে গিয়াছে। এখান হইতে বহুদূরে এক রাজা আছেন, তিনি অপুত্রক, তাই ধ্রুবকে পোষ্যপুত্র করিয়া লইয়া গিয়াছেন।" আমি উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলাম। তখন ঠাকুর আবার বলিলেন "কাঁদ কেন মা? তোমার ধ্রুব রাজার ছেলে হইয়াছে, রাজসুখ ভোগ করিতে পাইতেছে, তাহার জন্য কাঁদিতেছ কেন মা?"

কেন কাঁদিতেছি তাহা তুমি কি বুঝিবে সন্ন্যাসী! তুমি যদি এ জগতে কাহারও মা' হইতে, তাহা হইলে আজি আমার এই মাতৃহৃদয়ের "ইতিহাস" বুঝিতে পারিতে! আমি কাঁদিতে লাগিলাম। কেবল বলিলাম "এই দারুণ শোকের আগুনে জলিবার জন্যই কি আমি ধ্রুবকে পাইয়াছিলাম!"

যোগী সেই স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন "কেবল শোকের আগুনে জলিবার জন্য ধ্রুবকে পাইয়াছিলে, এমন কথা ভাবিও না মা। দেখ দেখি মা, ধ্রুব হইতে তুমি কত জিনিস পাইয়াছ! স্নেহ মমতা

পাইয়াছ, পরার্থপরতা পাইয়াছ—যাহার শক্তিতে এই বিশ্ব সৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে, সেই মাতৃ-হৃদয় তুমি ধ্রুবের জন্যই তো পাইয়াছ! শোকের জন্যই ধ্রুবকে পাইয়াছিলে, এমন কথা, ভাবিও না।"

আমি আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "আমার এ সকল জিনিসে কাজ কি ঠাকুর? আমার ধ্রুবই যদি গেল, তবে আমার মাতৃ-হৃদয়ে কাজ কি? জগতে যদি জলই না মিলিল, তবে পিপাসিতের আবশ্যক কি?"

তখন সেই পলিতকেশ সন্ন্যাসী আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "মাতৃ-হৃদয় লাভ করাই মা, নারীজীবনের সর্ব্বোচ্চ উন্নতি। রমণী যখন স্বার্থপরতা ও পার্থিবতাশূন্য হইয়া মাতৃ-হৃদয় লাভ করিতে পারেন, তখনই তিনি ভগবৎসাধনার সম্পূর্ণ উপযুক্তা হন। তুমি যে দিন তোমার হৃদয় হইতে স্বার্থ অর্থাৎ পার্থিব কামনাটুকু মুছিয়া ফেলিবে, সেই দিন তোমার মন নির্ম্মল হইবে, প্রকৃত শান্তি মিলিবে।"

আমি এ সব কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! নির্ম্মম, বনবাসী সন্ন্যাসী! তুমি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, আমার মত অজ্ঞানা রমণীকে, তর্কে তুমি এক পলকে হারাইয়া দিতে পারিবে, কিন্তু বেগবতী স্রোতস্বিনীকে তুমি ফিরাইতে পারিবে না! আমার যে শোক-প্রবাহিণী উথলিয়া উঠিয়াছে, ইহাকে নিবারণ করিতে তোমার সাধ্য নাই! আমি কোনও কথা কহিলাম না, কাঁদিতে লাগিলাম।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া ঠাকুর পুনরপি কহিলেন "বুঝিতেছ না মা, তুমি আজিও ধ্রুবকে খাঁটী ভালবাসা দিতে পার নাই। কতকটা তোমার জন্য ভাল বাসিয়াছ, কতকটা ধ্রুবের জন্য ভাল বাসিয়াছ! তাই ধ্রুব রাজসংসারে রাজসুখ ভোগ করিতে গিয়াছে; তোমার যাহা কল্পনার অতীত, ধ্রুব সেই সব সুখ ভোগ করিতে পাইবে, এ সব বুঝিয়াও তুমি সুখী হইতেছ না! কথা কি, মা, তোমার দৃষ্টি কেবল সেই ধ্রুবের সুখের উপরে নহে, নিজের সুখের উপরেও আছে। তাই বলিতেছি মা, তোমার গভীর স্নেহের সহিত স্বার্থপরতা জড়িত হইয়া আছে। যতক্ষণ উহা ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ধ্রুবকে সহস্র সুখী দেখিয়াও তোমার সুখ হইবে না। মানুষ, মানুষকে ভালবাসিয়া সাধারণতঃ যে সুখী হয় না, তাহার কারণ তাহাদের মধ্যে স্বার্থপরতার যোগ থাকে বলিয়া। এখন বুঝিলে কি মা?"

আমি আশাশূন্য উদাসনেত্রে সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া বলিলাম "ঠাকুর! এই রকম জিনিস যদি স্বার্থপরতা হয়, তবে ভালবাসার মধ্য হইতে ইহা উৎপাটন করা কি নর মানবের সাধ্য?" ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন "সাধনায় কি মানুষ এক দিনেই সিদ্ধ হয় মা? বহুদিন, বহুমাস, বহুবৎসর ধরিয়া তপস্যা কর, তবে সিদ্ধিলাভ হইবে। শাক্যসিংহ কি এক দিনে বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন মা? কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জানিও, ভালবাসাই জগতের

সাধনীয়। ঘনীভূত, স্বার্থপরতাশূন্য ভালবাসার নামই প্রেম। মানব যখন আপনা ভুলিয়া পরকে ভালবাসিতে শিখিবে, তখনই এ জগৎ প্রেমাগার হইবে, মানব-হৃদয়ে সুখ, শান্তি মিলিবে। তুমি এই মহাসাধনা করিবে মা?"

আমি সত্য কথা বলিব; আমার ওসব কথা কিছুই ভাল লাগিল না। আমি বাবাজীর পায়ে মাথা লুটাইয়া বলিলাম "ঠাকুর! তুমি আমার পিতা, তুমি আমার পিতার মতন কাজ কর। যেখানে আমার ধ্রুব পোষ্যপুত্র হইয়াছে, আমাকে সেখানে দয়া করিয়া রাখিয়া এস, আমি সেই বাড়ীতে দাসী হইয়া থাকিব; আমার বাছার সোণামুখখানিতো এক এক বার দেখিতে পাইব।"

স্নেহময় পিতার মত উদাসীন স্নেহ-মাখা স্বরে বলিলেন "মা! তোমার শরীর বড়ই অসুস্থ দেখিতেছি। আজি তুমি আমার সেবালয়ে চল। তুমি একটু সুস্থ হইয়া উঠিলে যেখানে যাইতে চাও, যাইও, আমি তোমার সন্তানের মত তোমার আজ্ঞা পালন করিব।"

(৫)

আজি এক বৎসর হইল আমি সেবা-লয়ে আছি। এখানে আমি ঠাকুর মহাশয়ের কাছে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মোপদেশ শুনি, আর সেবালয়ের অনাথ, দরিদ্র বালকদিগকে আহার্য্য দিই। জিনিস সন্ন্যাসী ঠাকুরের, ভাগ করিয়া দিই আমি। হতভাগ্য বালকেরা আমাকে "মা" বলিয়া ডাকে। মা'র কাছে ছেলে যেমন আবদার ও অত্যাচার করে, এই সব পরের ছেলেরা আমার উপরে সেই রকম আবদার, সেই রকম অত্যাচার করে। আমি বেশ বুঝিতেছি, আমি না থাকিলে এই সব মাতৃহীন, বন্ধুহীন, নিরাশ্রয়দিগের এক দিনও চলে না।

এক দিন সন্ন্যাসী বাবাজী নিভৃতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, তুমি এখন সেবালয়ে থাকিবে, না তোমার ধ্রুবের কাছে যাইবে?"

আমি প্রাণ খুলিয়া উত্তর করিলাম "ঠাকুর! আমি ধ্রুবের কাছেই রহিয়াছি। সেই এক ফোঁটা ধ্রুব আমার প্রাণময়, বিশ্বময় হইয়া আছে। কি জড় জগৎ, কি জীব জগৎ, আমি যে দিকে চাই, সেই-খানে আমার ধ্রুবকেই দেখিতে পাই। আমার ধ্রুব ছাড়া অন্য কিছু আমি দেখিতে পাই না। আপনার সেবালয়ের অনাথ শিশুরা প্রত্যেকেই আমার ধ্রুব। আমি উহাদিগকে প্রতিক্ষণ আদর করিয়া বেশ বুঝি আমার ধ্রুবকেই আদর করিতেছি। উহাদিগকে খাওয়াইতে গিয়া মনে হয়, আমার ধ্রুবের মুখেই খাবার তুলিয়া দিতেছি। দুঃখী, দরিদ্রদিগের সুখের জন্য আমার যথাসর্ব্বস্ব আমি অনায়াসে, আনন্দে, ত্যাগ করিতে পারি; আমার মনে হয় যেন আমার ধ্রুবের সুখের জন্যই আমি এ ত্যাগস্বীকার করিতেছি। কাহারও দুঃখমলিন মুখ আমি সহিতে পারি না, আমার বোধ হয় আমার কাছে

ধমক খাইয়া আমার ধ্রুবই অমন ম্লান মুখ করিয়া আছে। ঠাকুর! আমি ধ্রুবের কাছে কোথায় যাইব? আমি ধ্রুবময় জগতে বাস করিতেছি।”

তখন সন্ন্যাসী বাষ্পাকুলচক্ষে গদগদ-স্বরে বলিলেন “মা! বিষ্ণুপুরাণের ধ্রুব যেমন তাহার মা'কে ‘হরি’ আনিয়া দিয়াছিল, দেখিতেছি তোমার ধ্রুবও তোমাকে সেই রকম ‘হরি’ আনিয়া দিয়াছে! আজি হইতে এ সেবালয়ের অধিকারিণী তুমি। অনেক দিনের কথা, সেই যে তুমি সেবালয়ের সেবিকা হইতে আসিয়াছিলে, তখন তোমাতে অন্যান্য যোগ্যতা সত্ত্বেও, আসল জিনিস ছিল না!—তখন মা, তোমার হৃদয় ছিল না, হৃদয়ে কোমলতা ছিল না; যাহার হৃদয় নাই, সে অন্যান্য বিষয়ে যতই উন্নত হউক না, ভগবতী বিশ্বজননীর সেবা করিতে সে অযোগ্য। তাই মা, সে দিন তোমাকে সেবালয়ের ভার দিতে, ‘মা’ জগজ্জননীর পুত্র কন্যাদিগকে পালন করিতে দিতে, আমার সাহস হয় নাই। তুমি চলিয়া গেলে, কিছু দিনের মধ্যে একটী নব-প্রসূতা রমণী পীড়িতা হইয়া সেবালয়ে আসিয়াছিল। তার পরে দশ দিনের শিশু সন্তানটী ফেলিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিল। সেই শিশুই তোমার ধ্রুব। আমিই তাহাকে তোমার গৃহদ্বারে রাখিয়া আসি। যে উদ্দেশ্যে রাখিয়া আসি, সে উদ্দেশ্য ভগবান্ সফল করিয়াছেন, ধ্রুবকে পালন করিতে গিয়াই তোমার সকল সঙ্কীর্ণতা এবং স্বার্থপরতা দূর হইয়াছে। এই রকম মাতৃপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেই নারীজীবনের সর্ব্বোচ্চ উন্নতি সাধিত হয়। এখন মা, তোমার হৃদয় প্রভাতের নবস্ফুট কমলের মত কোমল, পবিত্র ও স্নিগ্ধ হইয়াছে! এখন মা, তোমার হৃদয় ভগবানের আসনের যোগ্য হইয়াছে। নদী যখন প্রথম উৎপন্ন হয়, তখন সে গিরিপাদমূলে, ক্ষুদ্রতম রজতসূত্রের মত সূক্ষ্ম। সেই নদীই ক্রমশঃ বিস্তীর্ণা হইয়া দিগন্তপ্লাবিনী মূর্ত্তি ধারণ করে। মানবের প্রীতিবৃত্তিও একটি ক্ষুদ্র শিশুকে অথবা ব্যক্তি বিশেষকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ পাইতে থাকে। তার পরে সেই বৃত্তি অনন্ত-বিস্তৃতা হইয়া অনন্তদেবতার অভিমুখে গমন করে। এই জন্যই জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন, “দয়া গৃহ হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু সেখানে শেষ হয় না”। তুমি মা, ধ্রুবকে আত্মবিস্মৃতা হইয়া ভালবাসিয়াছ বলিয়া এ বিশ্ব জগৎকে ভালবাসিতে তোমার অধিকার জন্মিয়াছে! প্রকৃত ভালবাসাই মানবকে স্বর্গপথে লইয়া যাইবার প্রধান সহায়।”

আমি কোনও কথা বলিতে পারিলাম না। চোখ দিয়া বড়ই জল আসিতে-ছিল। যাহা হউক, সেই দিন হইতে সেবা-লয়ের সকল ভার আমার উপরেই পড়িল।

লেখিকা— শ্রীমা—

আদর্শ-জননী-কর্ণিলীয়া।

পুরাকালে ইটালির অন্তঃপাতী রোম এবং আফ্রিকার অন্তঃপাতী কার্থেজ নগর অতীব দুর্দ্ধর্ষ ও মহাপরাক্রমশালী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এক পক্ষে রোমের অধিবাসিগণ যেমন কার্থেজবাসীদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত, অন্য পক্ষে কার্থেজবাসিগণও রোমকদিগকে নিরতিশয় অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিত। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের এই প্রকার বিদ্বেষবুদ্ধির ফলস্বরূপ দীর্ঘকালব্যাপী এক ভীষণ সংগ্রাম উভয় জাতির মধ্যে সংঘটিত হইল। হানিবলের কর্তৃত্বাধীনে কার্থেজবাসিগণ ইটালী আক্রমণ করে। যখন শত্রুসেনাদল রোমনগর অবরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হয়, তখন রোমবাসীরা সিপিও নামক জনৈক মহাবলীয়ান্ সেনাপতির নেতৃত্বাধীনে অভ্যুত্থিত হইয়া অরাতিদলকে যুদ্ধে পরাজিত করে। অবশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া কার্থেজবাসিগণ বিজেতৃগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করে। বিজয়ী সেনাপতি সিপিওর সম্মানার্থ তাঁহাকে আফ্রিকেনাস এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কর্ণিলীয়া এই মহাবীর সিপিও আফ্রিকেনাসের দুহিতা। ইনি সেম্প্রোনিয়াস্ গ্রাকাস্ নামক জনৈক রোমবাসী যুবকের পাণিগ্রহণ করেন। মিশররাজ টলেমী কর্ণিলীয়াকে বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন, কিন্তু কর্ণিলীয়া মিশরবাসী যুবক অপেক্ষা রোমবাসী যুবকের পাণিগ্রহণ করাকে অধিক গৌরবসূচক জ্ঞান করিতেন, এজন্য তিনি টলেমীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন।

সেম্প্রোনিয়াস্ দুই শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাহাদিগের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার কর্ণিলীয়ার উপর নিপতিত হয়। কর্ণিলীয়া স্বয়ং শিক্ষিতা, গুণবতী ও ধর্ম্মপ্রাণা রমণী ছিলেন। পুত্রদ্বয় মহৎ লোক বলিয়া জনসমাজে সমাদৃত হউক, ইহা কর্ণিলীয়ার প্রাণগত ইচ্ছা ছিল। এই জন্য তিনি পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটির নাম টাইবিরিয়াস্ ও অপরটির নাম কেয়াস্। উহাদিগের সংশিক্ষাবিধানার্থ এক দিকে যেমন স্বয়ং শিক্ষাদান করিতেন, অন্য দিকে অপর সংশিক্ষক নিয়োজিত করিয়া তাহাদিগের সমুন্নতির সম্যক্ সহায়তা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

এক দিন জনৈক রোমবাসিনী রমণী কর্ণিলীয়ার সহিত সাক্ষাৎকরণার্থ তাঁহার গৃহে সমাগতা হন। এই রমণী রোমনগরে অতীব সমৃদ্ধিশালিনী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। ইনি নিরতিশয় অলঙ্কারপ্রিয়া ছিলেন। রোমনগরে কোন্ রমণী

কত প্রকার অলঙ্কার পরিধান করেন, ইনি তাহার সন্ধান করিয়া বেড়াইতেন। ইনি অলঙ্কারের পরিমাণ অনুসারে ভদ্রাভদ্র স্থির করিতেন এবং অলঙ্কার-হীনা রমণীগণকে অতীব কৃপাপাত্রী মনে করিতেন। এই রমণী আপনার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া যে ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা নহে, অপর লোককে দেখাইবার জন্য নানাবিধ অলঙ্কার-পরিপূর্ণ বাক্স সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতেন। এইরূপ অবস্থায় ইনি একদিন কর্ণিলীয়ার গৃহে গমন করেন। কর্ণিলীয়া ইহাঁকে যথোচিত সমাদর করিয়া বসাইলেন। ইনি নানা প্রকার হাবভাব প্রকাশ করিয়া স্বীয় অঙ্গের অলঙ্কার সকল কর্ণিলীয়াকে দেখাইতে প্রবৃত্তা হইলেন। রমণীর সেই সকল অলঙ্কার দেখিবার জন্য কর্ণিলীয়ার মনে বিশেষ কিছু কৌতূহল উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তিনি এক এক করিয়া অলঙ্কারগুলি দেখাইতে যখন অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন অগত্যা কর্ণিলীয়া সেই সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। অতঃপর সেই রমণী কর্ণিলীয়াকে বলিলেন "দেখাও দেখি তোমার কত অলঙ্কার আছে।" সেই সময়ে কর্ণিলীয়ার পুত্রদ্বয় বিদ্যালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইতেছিল। কর্ণিলীয়া গৃহাগত পুত্রদ্বয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দিদি! এই! আমার অলঙ্কার।"

টাইবিরিয়াস্ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহসী, মহাশয়, সরল, সত্যপ্রিয়, সত্যবাদী, সুবক্তা ও সদাচারসম্পন্ন বলিয়া জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন। কেয়স্ সর্ব্বথা সহোদরের সমকক্ষ না হইলেও বহুলরূপে তাঁহার গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। টাইবিরিয়াসের শান্ত ও মধুর প্রকৃতি যেমন শত্রু মিত্র উভয়ের হৃদয় মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ ছিল, কেয়াসের স্বভাব কিঞ্চিৎ রুক্ষ থাকাতে সেরূপ করিতে পারে নাই। সৈন্যদল সমরনিপুণ টাইবিরিয়াসকে এত ভালবাসিত যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া তাহারা এক মুহূর্ত্তকাল অতিবাহিত করিতে ক্লেশ বোধ করিত। সৈন্যদিগের কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার দেখিলে, এমন মধুর ভাবে, তিনি তাহাদিগকে শাসন করিতেন যে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের স্বভাব একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত।

সবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলদিগকে রক্ষা করিবার জন্য উভয় ভ্রাতাই আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্বদেশের সেবাতে তাঁহাদের অকাল মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পর তাঁহাদিগের সম্মানার্থ স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহাদিগের প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। কুলদীপক পুত্রদ্বয়ের পরলোকগমনে মনস্বিনী কর্ণিলীয়া শোকে ম্রিয়মাণা হন নাই, ধৈর্য্যের সহিত পুত্রশোক সম্বরণ করিয়াছিলেন। একদা এক রমণী কর্ণিলীয়াকে বলিয়াছিলেন, "আপনি নিতান্ত দুর্ভাগিনী, নতুবা এমন পুত্ররত্ন হারাইবেন কেন?" প্রত্যুত্তরে কর্ণিলীয়া বলিলেন, "গ্রাকাইদিগকে গর্ভে ধারণ

করিয়া যে রমণীর গর্ভ পবিত্র হইয়াছে, তাহাকে দুর্ভাগিনী মনে করা মহাভ্রম।” কর্ণিলীয়ার মৃত্যুর পর, রোমবাসীরা তাঁহার সম্মানার্থ যে স্মারক মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন, তাহাতে এই কয়েকটি কথা লিখিত ছিল “গ্রাকাইদিগের জননী কর্ণিলীয়ার স্মরণার্থ”—

আমাদের দেশে অধিকাংশ অশিক্ষিত রমণী নিরতিশয় অলঙ্কারপ্রিয়া। শিক্ষিতা নারীগণের মধ্যে এক্ষণে এই সংক্রামক রোগ আর দেখা যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একমাত্র শিক্ষাই এই রোগের মহৌষধ। অশিক্ষিতা রমণীগণ কবে মনস্বিনী কর্ণিলীয়ার মত সদ্‌গুণান্বিত সন্তানগণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন “দিদি! এই যে আমার অলঙ্কার।” শাস্ত্র যথার্থই বলিয়াছেন সৎপুত্রের উৎপত্তিতে “কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।”

যীশু খৃষ্টের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা।

যে যীশু খৃষ্ট আজি সভ্য-জগতে ‘ঈশ্বর’ বলিয়া পূজিত, ১৮৬২ বৎসর হইল তাঁহার স্বজাতীয় ইহুদীগণ বিধর্ম্মী ও রাজবিদ্রোহী বলিয়া রোমীয় শাসনকর্ত্তা পাইলেটের নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ করে এবং সেই শাসনকর্ত্তা খৃষ্টকে দুই-জন তস্করের সহিত ক্রুশবিদ্ধ করিয়া নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিবার আদেশ দেন। একখানি প্রস্তরফলকে এই প্রাণদণ্ডাজ্ঞার বিবরণ খোদিত হইয়াছিল। রোমনগরীর ৫৩ মাইল উত্তরপশ্চিমস্থ কোন স্থান ইংরাজি ১২০০ সালে খনন করিতে করিতে খনিত স্থান হইতে এই প্রস্তর-ফলকখানি উদ্ধৃত হয়। তাহাতে যাহা লেখা ছিল, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—“সম্রাট টাইবিরিয়স্ সিজারের ১৭ বৎসর রাজত্বকালে ২৫এ মার্চ্চ তারিখে, আমি প্রিটোরের শাসনকর্ত্তা পন্টিয়স্ পাইলেট নেজারেথের যীশুর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বিধান করিতেছি, তাহাকে ক্রুশকাষ্ঠোপরি দুই জন চোরের মধ্য-স্থলে মরিতে হইবে। কুইন্‌টিয়স্ কর্ণিলীয়স্ তাহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবে।”

প্রস্তরফলকে আরও নিম্নলিখিত কথা-গুলি খোদিত ছিল:—

“এই দণ্ডাজ্ঞাপত্রে অনেকগুলি লোকের স্বাক্ষর ছিল। তন্মধ্যে প্রথম ডানিয়েল রাবি কারিসি; দ্বিতীয় জোহানেন রাবি, তৃতীয় রাফেল, চতুর্থ কপেট—একজন সামান্য নগরবাসী। এই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।”

“যে চোর খৃষ্টের দক্ষিণ দিকে ক্রুশে হত হয়, তাহার নাম ডিস্‌মাষ্ট এবং যে বামে হত হয়, তাহার নাম জেষ্টিস।

পণ্টিয়স পাইলেট এই শোচনীয় ঘটনা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, তৎকালে সমুদায় পৃথিবী এরূপ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয় যে, লোকে মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত বাতি জ্বালিয়া রাখিয়াছিল।"

বোধ হয় খৃষ্টের মৃত্যুর পর পাইলেট রোমীয় সম্রাটের নিকট এই ঘটনা রিপোর্ট করেন এবং তাহাই স্মরণীয় বলিয়া প্রস্তরফলকে খোদিত হয়। এই জন্য এই দলিল ইটালীদেশে ছিল, পরে প্রাচীন তত্ত্ব অনুসন্ধানার্থ সেই স্থানটি খুঁজিতে খুঁজিতে প্রস্তরখানি বাহির হয়।

যাহা হউক কালের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যে প্রভু যীশুর দোষের বিচার করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বিধান করিলেন, তাঁহার প্রভুদিগের প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য কোথায় স্রোতে ভাসিয়া অদৃশ্য হইয়াছে, আর সেই ক্রুশে হত যীশু মৃত্যুঞ্জয় হইয়া কোটী কোটী নরনারীকে ধর্ম্মজীবন দান করিতেছেন।

হরপার্ব্বতী সংবাদ।

(শিবপুরাণ হইতে অনুবাদিত)

১

হর প্রতি প্রিয়ভাবে ক'ন হৈমবতী,
"মরতে যেতেছে কলি, দেব পশু-পতি!
ধরায় ঘটিবে তাহে কত কদাচার,
সকলি জানিছ তুমি, কি বলিব আর?
শুনিলাম কলিযুগে নর নর সবে,
সহধর্ম্মিণীর নাকি বশ নাহি হবে?—
এ-কথা শুনিয়া মম পুড়িতেছে মন,
রমণীই বোঝে দেব, রমণী-বেদন!
অতএব যাহা হয় সদুপায় তার,
সেই কথা কহ প্রভো, মিনতি আমার।
শিব-পুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী বলে শুনে পুণ্যবতী।

২

হর বলে "হরিণাক্ষি! মিছা কথা নহে,
'অনাচারী কলিযুগ' সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে।
সকলে অধর্ম্মে রত না হইবে কভু—
অনেকে অনেক দোষ পরশিবে তবু!
কলি-ধর্ম্ম কথা পরে কহিব সকলিঃ—
আজি যা' সুধিছ দেবি, তাই তোমা বলি;
ম্লেচ্ছ শাস্ত্র "বেন বার্ক" করিয়া চর্ব্বণ,
হইবে হৃদয়হীন নর কত জন;
বচনে "পরুষ" তারা, পরাণ নীরস,
নাহি হবে গৃহিণীর যথোচিত বশ।"
শিব-পুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী বলে শুনে পুণ্যবতী।

৩

শুনি বিষাদিনী শিবা, চাহে শিব পানে,
দেখিয়া করুণাময় সকরুণ প্রাণে,
বলিলেন "দুঃখভা'ব, কি হেতু পার্ব্বতি,
'কর্ম্ম-যোগে' রমণীর বশ হবে পতি;
সদাচার, মহৌষধ, করিলে রমণী,
রবে তার বশীভূত সদা গুণমণি।
এই কথা পদ্মাসন কহিলেন ব্যাসে,

আমিও বলিব আজি তোমার সকাশে ;
পরম পবিত্র ইহা গোপনীয় অতি,
এক মনে সযতনে শুন তবে সতি!"
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৪

"পতি যার বাধ্য নহে আরো অবিনীত,
সে নারী আলস্যে সদা রহিবে জড়িত ;
প্রভাতের আট ঘণ্টা হইবে যখন,
ললনা, বিছানা ছাড়ি উঠিবে তখন ;
দুই পা ছড়ায়ে বসি অতি পরিপাটী ;
মনসুখে চাঁদমুখে খাবে পোড়া মাটী।
পরেতে সুগন্ধি তেল শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া,
সাবান, তোয়ালে নিয়ে রহিবে বসিয়া,
দিবানিশি চারু চুলে এলবার্ট করি,
করাইবে গৃহকর্ম্ম পরাপরে ধরি।"
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৫

"আপিসে চাকরি করে দয়িত যাহার,
মাটী না পরশে যেন চরণ তাহার ;
গহনা পোষাকে দেহ সাজায়ে সুন্দর,
বসি রবে সোণামুখী, খাটের উপর ;
ঝি আসি মুছিবে ঘাম বাতাস করিয়া,
দিবেন বামুন দিদি মুখে 'ছুটি' দিয়া।
সময় কাটিবে নিয়ে নভেল কি তাস,
অথবা সঙ্গিনী সনে বৃথা পরিহাস।—
তদভাবে ঝি চাকরে মিছা অপরাধে,
করিবে কলহ সতী পরাণের সাধে।"
শিবপুরাণের কথা অমৃত-উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৬

"দরিদ্র যাহার পতি, সদা সে ললনা,
চাহিবে পতির কাছে পোষাক গহনা ;
সে কথা শুনিয়া তিনি দেন যদি 'তাড়া',
বিরাশি সিক্কায় সতী দিবে মুখনাড়া ;
আদেশ করিবে নাথে করিবারে ঋণ,
না শুনিলে, অনাহারে র'বে তিন দিন।
এইরূপে 'সতীধর্ম্ম' করিয়া পালন,
পতি-সোহাগিনী হবে শাস্ত্রের লিখন।"
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মা-রাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৭

"ইহাতেও যার পতি বশ নাহি হবে,
সে নারী অপ্রিয় কথা নিরন্তর ক'বে।
পরিজন সনে সদা করিবেন আড়ি,
এক ঘরে হবে তাহে আট দশ হাঁড়ী।
শাশুড়ীরে বধূ নাহি করিবে ভকতি,
যা' ননদী দূর করি দিবে গুণবতী ;
কলহ করিবে সদা প্রতিবাসী সনে,
দয়া, মায়া, সরলতা, না রাখিবে মনে।
র'বে সদা রুক্ষ ভাবে, বদন বিরস ;
দেখি শুনি হবে পতি অতি ত্বরা বশ।"
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মা-রাম-দাসী বলে শুনে পুণ্যবতী।

৮

"ইহাতেও পতি যদি অ-বশ রহিবে,
পরম যতনে সতী ছেলে ঠেঙ্গাইবে ;
ভাঙ্গিবে কলসী, হাঁড়ী, ছিঁড়িবে বসন ;
পতি সনে দেখা হ'লে করিবে রোদন।
কখনো বা রক্তনেত্রে চাহি তাঁর পানে,
বলিবে 'চলিনু আমি শমনের স্থানে'।

একবিন্দু ছুতা সদা বেড়াবে খুঁজিয়া,
পেলেই—বাপের বাড়ী যাইবে চলিয়া—
সেখানে যদ্যপি পতি নাহি দেন যেতে,
ঘ্যানঘ্যানে, ঘুমা'তে না পান যেন রেতে!
পতি বিনা রমণীর গতি নাহি আর,
তুষিবে তাঁহারে তাই করি সদাচার।"
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৯

"এত করি পতি যার বশ নাহি হয়,
সে নারী মঙ্গলবারে সন্ধ্যার সময়,
এলো চুলে,ভিজা বস্ত্রে, হাঁটিয়া ত্বরিতে,
গোমূত্র, গোবর নিয়া গোহাল হইতে,
ঘুমন্ত পতির শিরে দিবে সেই রস
অশিষ্ট, অবাধ্য পতি, তাহে হবে বশ।
বিজ্ঞান অজ্ঞান হেথা—শাস্ত্রের বচন,
কোন মতে হৈমবতি, নাহিক খণ্ডন।—
অতএব, দেখি শুনি পতির অবস্থা,
রোগের ঔষধ সতী করিবে ব্যবস্থা।
কলিতে এ 'পুণ্য-গাথা' করিয়া প্রচার,
'বামাবোধিনী'র হবে সৌভাগ্য সঞ্চার।
ভক্তিভাবে এই তত্ত্ব পড়িবে যে জনে,
কমলা অচলা রবে তাহার ভবনে;
আরো, আয়ু, পুণ্য, যশ, বস্ত্র লাভ হয়,
ব্রহ্মার মুখের আজ্ঞা নাহিক সংশয়।"
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

অনুবাদিকা—শ্রীআত্মারাম দাসী।

গৃহিণীপণা।*

মুরশিদাবাদের সন্নিকটে এক নিঃস্ব পরিবার বাস করিতেন। বড় গৃহস্থ। সাত ভাই, তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী ও পুত্র কন্যাগণ একত্রে একান্নভুক্ত থাকিয়া সুখে কাল-যাপন করিতেন। ভ্রাতৃগণ প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত অপরের ভূমিকর্ষণাদি করিয়া যাহা পারিশ্রমিক পাইতেন, তাহাতেই কষ্টে সকলের ভরণ পোষণ সম্পন্ন হইত। অর্থের সচ্ছলতা ছিল না বটে, কিন্তু মনের সুখ ছিল—সন্তোষ ছিল—শান্তি ছিল। ভ্রাতাদিগের মধ্যে যেমন সৌহৃদ্য ভাব ছিল, বধূগণের মধ্যেও সেইরূপ। তাঁহারা পরস্পরের পুত্রকন্যাগণকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, একের সুখে অপরে সুখী হইতেন, এবং দুঃখে দুঃখী হইতেন। সকলেই পর্য্যায়ক্রমে সংসারের রন্ধনাদি কার্য্য করিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বার্থ-পরতা ছিল না। সাতটী বউএর মধ্যে ছোট বউ সাক্ষাৎ শ্রীরূপিণী ছিলেন। তিনি এক দিন ভাবিলেন, ইহাঁরা কয় ভ্রাতায় সমস্ত দিন

* ৩ ১৪ই বৈশাখের "সময়ে" বাবু বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য এই প্রবন্ধটী লেখেন, ইহা নারীগণের বিশেষ উপযোগী বলিয়া বামাবোধিনীতে উদ্ধৃত ও প্রকাশিত হইল। বা, বো, সং।

পরিশ্রম করিয়া কেবল দৈনিক ব্যয়ের সংস্থান করিতেছেন, যদি কিছু দিন পারিশ্রমিক না পান, তবে সংসার চলা ভার হইবে; অতএব কিছু সঞ্চয় করা আবশ্যক। সেই দিন হইতে তিনি,—টাকা পয়সা কোথায় পাইবেন,—অত্যাবশ্যক খাদ্য-দ্রব্য তণ্ডুল তৈল লবণাদির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অপরের অজ্ঞাতসারে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সঞ্চিত রাখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কয়েক মাসের মধ্যে পাঁচ সাত দিন তাঁহাদের সংসার চলিতে পারে এরূপ তণ্ডুলাদি সঞ্চয় করিলেন।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে বৃষ্টি পড়িতেছে। সাত ভাই বিষণ্ণবদনে স্ব স্ব দ্বারদেশে উপবিষ্ট আছেন—আজ কোথাও মুজরী জুটিবে না। পর দিনও সেইরূপ। মুষলধারে বৃষ্টি—বিরাম নাই—গৃহের বাহির হওয়া দুষ্কর। বাড়ীতে খাদ্যসামগ্রী কিছুই নাই। কল্য প্রতিবেশীর নিকট ধার করিয়া চলিয়াছে, অদ্য আর কে ধার দিবে? কিরূপে পরিশোধ করিব এ ভয় যাহাদের আছে, লোকে তাহাদিগকে ধার দেয় না, যাহাদিগের নিকট প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকেই প্রায় ধার দিয়া থাকে। ভ্রাতারা ভাবিতেছেন, অদ্য সকলকে অনশনে মরিতে হইবে। আপনারা তাহা পারেন, পুত্র কন্যাগণের ক্ষুধা-ক্লিষ্ট শুষ্কবদন কিরূপে দেখিবেন? তাঁহাদের বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া ছোট বউ নিজ স্বামীকে বলিলেন "আপনারা ভাবিতেছেন কেন? আমি অদ্য আপনাদের সংসার চালাইব।" স্বামী উত্তর করিলেন "তুমি পরিহাস করিতেছ নাকি? এ পরিহাসের সময় নহে।" স্ত্রী বলিলেন "পরিহাস নহে। আপনাদের প্রতি আমার এক অনুরোধ আছে—অদ্য আমি রন্ধনশালার দরজা বন্ধ করিয়া রন্ধন করিব, কেহ সে গৃহে যাইবেন না; এবং কিরূপে আমি দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলাম, তাহাও কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

তাহাই হইল। যথাসময়ে ছোট বউ রন্ধনাদি সমাপন করিলেন। সকলে অতীব তৃপ্তি সহকারে আহার করিলেন। পরে সহোদরগণ সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া, পরামর্শ করিলেন "ছোট বউয়ের প্রতি লক্ষ্মীর বিশেষ কৃপা আছে; আমরা বহু ভাগ্যফলে এমন বউ পাইয়াছি। অতঃপর কেহ তাঁহার মত না লইয়া কোন কার্য্য করিব না; এবং যাহা উপার্জ্জন করিব, তাঁহার নিকট রাখিব।" ছোট বউয়ের নিকট এই প্রস্তাব করা হইলে তিনি উত্তর করিলেন, "আমি সম্মত আছি, কিন্তু আপনাদিগকে আমার একটী কথা রাখিতে হইবে। আপনারা প্রতিদিন স্ব স্ব কার্য্য সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময় কোন একটী দ্রব্য লইয়া আসিবেন। কেহ ক্ষেত্রের কোন একটী ফল বা মূল, কেহ একখানি শুষ্ক কাষ্ঠ ইত্যাদি যিনি যাহা পারেন আনিবেন—কেহই রিক্তহস্তে আসিবেন না।" সকলেই সম্মত হইলেন। এক দিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় রহস্য

করিবার অভিপ্রায়ে, রাস্তা হইতে একটী মৃত সর্প এক যষ্টি দ্বারা উঠাইয়া লইয়া চলিলেন। বাটীতে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন "অন্য আর কিছু পাইলাম না; প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত এই সর্প লইয়া আসিয়াছি।" যাঁহারা হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করেন, যাঁহাদের মনের বল আছে, তাঁহারা সকল বিষয়েই সফল-মনোরথ হন। স্ত্রী উত্তর করিলেন "যাহা আনিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট, উহা ঐ মাচার উপর রাখিয়া দিন।" মৃত সর্পটীকে মাচার উপর নিক্ষেপ করিবামাত্র এক চিল শূন্য হইতে নামিয়া তাহা লইয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিলেন একছড়া বহুমূল্য রত্নখচিত স্বর্ণহার চিলের নখর হইতে তাঁহাদের সম্মুখে ভূমিতে পড়িল। ভ্রাতাদিগের বড় আনন্দ, হার বিক্রয় করিলে অনেক টাকা হইবে, ঈশ্বর এত দিনে তাঁহাদের দুঃখ ঘুচাইলেন। কিন্তু ছোট বউয়ের তাহা অভিপ্রেত নহে। তিনি বলিলেন "এ হার বিক্রয় করা হইবে না, রাখিয়া দেওয়া হউক।" কেহ তাঁহার কথা অবহেলা করিতে পারেন না। হার যত্ন সহকারে রাখিয়া দেওয়া হইল।

অল্প দিন পরে দেশের বাদশাহ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, চিলে তাঁহার বেগমের এক ছড়া বহুমূল্য হার লইয়া গিয়াছে—যে কেহ সেই হার দিতে পারিবে, তাহাকে প্রচুর পারিতোষিক দেওয়া হইবে। ছোট বউয়ের পরামর্শ মত সেই হার বাদশাহের সমীপে প্রেরণ করা হইল। বাদশাহ তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ ও ভূমি সম্পত্তি দিলেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যের সীমা রহিল না। সকলে বলিলেন "ছোট বউ মানবী নহেন—দেবী।" শুনিয়াছি সেই কয় ভ্রাতাই জগৎশেঠের আদিপুরুষ। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ জগৎশেঠের বংশ কাহার অবিদিত আছে?

আবু গিরি।

আবু পর্ব্বত রাজপুতানার সিরোহি-প্রদেশে অবস্থিত। ইহার উচ্চতা ৫।৬ হাজার ফিট। ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন জৈন মন্দির সকল এই পর্ব্বতে আছে বলিয়া ইহা অতি প্রসিদ্ধ এবং দেশের সর্ব্ব স্থান হইতে যাত্রী সকল এখানে আসিয়া থাকে। জৈনেরা আস্তিক বৌদ্ধদিগের এক সম্প্রদায় এবং তাঁহারা সিদ্ধপুরুষ ও অবতারের পূজা করিয়া থাকেন। আবু পর্ব্বতের উচ্চ ও সমতল স্থান সকলে অসংখ্য বেদী, মন্দির ও সমাধিগৃহ আছে, এবং সেই গুলি অতি আশ্চর্য্য কারুকার্য্য দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। পর্ব্বতের শিখরদেশে

একটী গোলাকার সমতল ভূমি আছে, তন্মধ্যে একটী গহ্বর—এই গহ্বরে একখানি রক্তবর্ণ প্রস্তরে দাতা-ভৃগুর পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে। ইনি বিষ্ণুর এক অবতার। গুরুশিখরা নামক সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে মধ্যস্থলে প্রধান দুইটী দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দির দুইটী শ্বেত মার্ব্বেলে নির্ম্মিত। ভারতবর্ষের মধ্যে এমন সুন্দর মন্দির এবং জৈন কারুকার্য্যের আদর্শ অতি অল্প স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির দুইটীর মধ্যে যেটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহাও প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। দুই ধনাঢ্য বণিক্ সহোদর ইহা প্রস্তুত করিয়া দেন। এই মন্দিরে যেরূপ সূক্ষ্ম ও মনোহর খোদকারী কার্য্য আছে তাহার তুলনা প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না। প্রাচীন মন্দিরটী ১০৩২ খৃষ্টাব্দে বিমল সা নামক এক ধনী বণিক নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইহার গঠনপ্রণালী যদিও সরল, তথাপি ইহার মধ্যেও প্রচুর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরের মধ্যে দীপালোকোজ্জ্বল একটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে, তাহাতে পরেশনাথ দেব আসনপিঁড়ি দিয়া বসিয়া আছেন। ইহার বারাণ্ডা ৪৮টী স্তম্ভ দ্বারা নির্ম্মিত। ১৪০ ফিট দীর্ঘ ও ৯০ ফিট প্রস্থ এক চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত। তাহার চারি দিকে দুই সারি স্তম্ভ-শোভিত বারাণ্ডা। এই বারাণ্ডাগুলিতে ৫৫টী ক্ষুদ্র গৃহ আছে। তাহাদের এক একটীর মধ্যে এক এক পরেশ-নাথমূর্ত্তি। দরজার উপর ও প্রাচীরে অনেকগুলি খোদিত মূর্ত্তি আছে, তাহা দ্বারা এই দেবতার জীবনের নানা অবস্থা বর্ণিত। সম্রাট্ আকবর ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁহার রাজত্বের সপ্তত্রিংশ বর্ষে শ্বেতাম্বরী জৈন সম্প্রদায়ের গুরু হরবিজয় সূরকে আবু পর্ব্বত ও মন্দির এবং ভারতের অন্যান্য জৈন তীর্থস্থান সকল দান করেন এবং এই সকল স্থানে পশুহত্যা নিবারণ করিবার আদেশ দেন। এই সুবিজ্ঞ সম্রাটের সনন্দপত্রে লিখিত আছে "ঈশ্বর-উপাসকদিগের নিয়ম এই যে, তাঁহারা সকল ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন।"

শুভ জন্মোৎসব।

ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ তাঁহার পার্কষ্ট্রীট ভবনে তাঁহার শিষ্যগণ এবং পুত্র পৌত্র, দুহিতা দৌহিত্র প্রভৃতি পরিজন তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া তাঁহার সহিত পরব্রহ্মের উপাসনা করেন। উপাসনান্তে পুষ্পবৃষ্টিতে তাঁহাকে ডুবাইয়া

দিয়াছিলেন ; কেহ কেহ কবিতোপহারও দেন। সহচর পত্রিকাতে প্রকাশিত একটী কবিতার কিয়দংশ আমরা আনন্দের সহিত এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

চাঁদের কিরণাভাব করিতে বিদূর
সারাদিন ভাতে যথা রবি ভ্রাজমান,
সেইরূপ অস্তমিত আর্য্যজ্যোতি স্থানে
হে গুরো,দেবেন্দ্র,দেব,তুমি জ্যোতিষ্মান্।

পরম পিতার ইচ্ছা করিতে পালন,
এসেছ মরতে গূঢ় লক্ষ্য সাধিবারে—
সাধিত সাধনা-শিক্ষা, নিষ্কাম সংসার,
উদ্ধারিলে মগ্নজনে কল্পনা-পাথারে।

যে মহা অমৃত তুমি মানবের হিতে
উদ্ধারিলে বেদার্ণব করিয়া মন্থন,
শ্রদ্ধায় যে জন তাহা করিবেক পান
অনন্ত কালের গর্ভে অমর সে জন।

দৃশ্য-পট মাঝে তুমি শরীরী মানব,
অশরীর স্বর্গবাসী দেবতা অন্তরে,
একাধারে যোগী হ'য়ে ভ্রম যোগপথে,
নির্ব্বহ সংসার 'তস্য প্রিয় কার্য্য' তরে।

যে ভানে মগন তুমি যাহা কর ভোগ,
অহোরাত্র যে আলো করিছ সন্দীপন,
যে আনন্দ বাদ্য গান সুধারাশি ঢালে
তোমার হৃদয়ে, তাহা অপরে গোপন।

সাধিয়া আপন কার্য্য উর্দ্ধমুখী তুমি
বসি আছ বিধাতার আদেশ চাহিয়া,
বিধাতার স্বহস্তের পুরস্কারলোভী,
প্রবাস এ পৃথিবীরে পশ্চাতে রাখিয়া।

একোন-অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে আজ,
হে দেব, করিলে তুমি পুণ্য-পদার্পণ,
তাই এই শুভ লগ্নে গাঁথি জয়মালা,
এসেছি তোমারে তাহা করিতে অর্পণ।

এই সে জয়ের মালা গাঁথা ভক্তি-ফুলে
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা চন্দনে চর্চ্চিত,
লহ দেব কৃপা করি, কর আশীর্ব্বাদ,
স্থির থাকি সে পথে যা তব পদাঙ্কিত।

যোগ-সমর্পিত-কর্ম্ম-সমাহিত তুমি,
কি আর তোমার তরে যাচিব স্রষ্টারে,
কুশলে উত্তীর্ণ হও, এই মাত্র যাচি,
সকৃৎ-প্রভাত-বাসে, তমিস্রের পারে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাদের ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সহিত সমবয়স্ক। উভয়েই ৭৮ বৎসর অতিক্রম করিয়া এই জ্যৈষ্ঠ মাসে ৭৯ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। মহর্ষি মহাকুলসম্ভূত,প্রিন্স দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রূপে গুণে,ধনে পুত্রে, যশে পৌরুষে যেমন সৌভাগ্যবান্, দয়াশীলতা, দেশহিতৈষিতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠতা গুণে সেইরূপ জগৎবিখ্যাত। তথাপি তিনি শেষ জীবনে সংসারবিরাগী যোগী হইয়া "ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপানে" ডুবিয়া প্রাচীন ঋষিজীবনের পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার জীবন অতি মূল্যবান্, তিনি আরও দীর্ঘজীবী হইয়া ভারত মাতার তাপিত হৃদয় শান্তিময় করিয়া রাখুন।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৪এ মে মহারাণী বিক্টোরিয়া ৭৮ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৭৯ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। ইহাঁর পুত্র, কন্যা, পৌত্র, প্রপৌত্র দৌহিত্রাদি লইয়া ৭০টী বংশধর হইয়াছে। মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বর সগোষ্ঠি মহারাণীকে দীর্ঘজীবিনী করুন।

২। দাক্ষিণাত্যে হিন্দু ও খৃষ্টানে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া অনেক গুলি লোক হতাহত হইয়াছে। খৃষ্টানদের গির্জার নিকট দিয়া কোলাহল সহকারে হিন্দুর রথ যাইতেছিল, খৃষ্টানেরা সহ্য করিতে না পারিয়া হিন্দুদিগকে আক্রমণ করেন। ক্রমে উভয় পক্ষ উত্তেজিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। খ্রীষ্টানেরা খৃষ্টের উপদেশ ভুলিয়াছেন, হিন্দুদেরও ধৃতি ক্ষমা কোথায়?

৩। যে জাপানী চীনদূত লিহনকাংকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে, জাপান গবর্ণমেণ্ট তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন। চীনেরা ফর্ম্মোসা দ্বীপ জাপানের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

৪। ১৯এ মে মুসলমান অনাথ-নিবাসের বার্ষিক সভা মাদ্রাসা স্কুলগৃহে অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। নবাব সায়েদ আমীর হোসেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদক জজ আবুল হোসেন এই আশ্রমের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নশীল। আশ্রমে ৭২টী বালক ও ২টী বালিকা আছে। ইহার আয় ১৮০০০ ও ব্যয় সাত হাজার টাকার উপর হইয়াছে। আশ্রমের ফণ্ড হইতে যেমন বালক বালিকারা শিক্ষিত হয়, সেইরূপ কয়েকটী বিধবাও প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

৫। দর্শনশাস্ত্রে ডাক্তার একটী মাত্র স্ত্রীলোক। তাঁহার নাম ডাক্তার হেলেন ওয়েবেষ্টার। ইনি ওয়েলেস্‌লি কলেজে শিক্ষিত হন; পরে জর্ম্মণিতে গিয়া অসীম পরিশ্রমে অধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক এই উপাধি লাভ করিয়াছেন।

৬। লেডেন ওয়ার্থের ভূতপূর্ব্ব জজের বিধবা পত্নী বিবি স্কট টেক্সাসে প্রায় আট লক্ষ বিঘা ভূমির অধিকারিণী। তাঁহার ৭।৮ হাজার গো মহিষ আছে। তিনি, এই বৃহৎ জমিদারীর কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

৭। চিনসাম্রাজ্ঞী রাজভবন মধ্যে একটী বৃহৎ রেসমী বস্ত্রের কারখানা খুলিয়াছেন। হাজার হাজার বালিকা ও বয়স্কা স্ত্রীলোক এখানে কাজ করিয়া জীবিকা লাভ করিবে। সাম্রাজ্ঞী স্বয়ং কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন।

৮। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ইতিপূর্ব্বে স্ত্রী-কালেজের বিরোধী ছিলেন। এখন তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার মতে বালিকারা বালকদের অপেক্ষা ভাল শিক্ষা করিতেছে এবং স্ত্রীলোকদের বিদ্যানুরাগিতার অনুসরণ করা পুরুষেদের উচিত।

পুস্তকাদিসমালোচনা।

সামুদ্রিক শিক্ষা—শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৩৲ টাকা। কর-রেখা দ্বারা নরনারীর ভাগ্য পরীক্ষা এদেশে বহুকাল হইতে চলিত আছে এবং তাহা ভণ্ড গণকদিগের উপার্জনের এক উপায়। কিন্তু মূলে কিছু সত্য না থাকিলে তাহার ভান সম্ভব নয়। রমণ বাবু বহুদিন শিক্ষা ও পরীক্ষা দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা সরল ভাবে সর্ব্ব সাধারণের গোচর করিয়াছেন। বিষয়টী অনুসন্ধান-যোগ্য এবং যদি ইহাতে কিছু সত্য থাকে, তাহা সাদরে গ্রহণীয়। গ্রন্থকার সুন্দর চিত্রাদি দ্বারা গ্রন্থখানি সুবোধ্য করিয়াছেন।

নির্ঝরিণী ও বিরাটনন্দিনী—পশ্চাৎ সমালোচ্য।

বামারচনা।

কোন একটি বালিকার প্রতি।

প্রেমে ভরা ছবিখানি হাসি হাসি মুখ,
হেরে তোরে চাঁদমণি ভুলে যাই দুখ।
সুটানা নয়ন দুটি স্নেহের চাহনি,
আনন্দলহরী তায় খেলিছে আপনি।
ক্ষুদ্র তনুখানি তোর সোহাগেতে পোরা,
ঐ ছোট প্রাণখানি মাধুরিমা-ভরা,
গড়েছে বিধাতা তোরে কোমল আদরে
তাই এত ভালবাসা প্রাণের ভিতরে।
"মালতী মুকুল"বলি যে ডাকেরে তোরে,
ছুটে গিয়ে কত প্রেম ঢেলে দাও তারে।
কচি হাত দুটি দিয়ে গলা জড়াইয়ে,
বুকের উপর দেও মাথা নোয়াইয়ে,
প্রফুল্ল বদনে কও কত মধুকথা,
শুনে প্রাণ ভুলে যায় সংসারের ব্যথা;
কতই করুণা ধর বিমল অন্তরে,
নিতান্ত ব্যথিত হও হেরিলে কাতরে।
ছুটাছুটি ব্যগ্রভাব সেবিতে তাহারে,
কতই যতন কর মমতার ভরে,
মুখানি শুথায়ে যায় বেদনা দেখিলে,
উজ্জ্বল নয়ন দুটি ভরি উঠে জলে;
এত ভাল বাসা বাসি কেন তোর প্রাণে,
জগৎ বুঝে না ইহা স্বার্থভরা মনে,
স্বরগের ফুল তুমি ফুটেছ ধরায়,
আমোদিত এ ভুবন সৌরভপ্রভায়।
মালতী ফুলেতে গাঁথি সুচিকণ হার,
বাসনা প্রাণেতে দিব গলে দেবতার।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী,
কানপুর।

হেঁয়ালির উত্তর।

ক, চ, ট, ত, প, এ পঞ্চ বর্গের ভিতর
পঞ্চম বর্গের যেই পঞ্চম অক্ষর,
বৈশাখের হেঁয়ালির তাহাই উত্তর;
পাঠ মাত্র বিনায়াসে বলিনু সত্বর।

শ্রীমতী—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৬ সংখ্যা।	আষাঢ় ১৩০২—জুলাই ১৮৯৫।	৫ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মোৎসব—এই উপলক্ষে এ বৎসরও অনেকে উপাধি লাভ করিয়াছেন। মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণকে "রাজা" উপাধি দিয়া গবর্ণমেণ্ট গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগকে বি, এ, উপাধি দেওয়া হইবে, সম্প্রতি স্থির হইয়াছে। ভারত-রমণীগণ উপাধিলাভের অধিকার বিষয়ে ইংরাজ রমণীগণ অপেক্ষা সৌভাগ্যবতী।

দান—পাটনার কাজী রাকা হোসেন খাঁ বাহাদুরের পত্নী কাজিমান বেহারের মুসলমান ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহাতে ...ী স্থায়ী ফণ্ড হইবে।

মৃত্যু—(১) কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সভাপতি হারী লি, সি, এস, পীড়ার জন্য ছুটী লইয়া বিলাত গিয়াছিলেন, সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। ইনি একজন সুযোগ্য ও মহাশয় রাজকর্ম্মচারী ছিলেন।

(২) গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সুবিখ্যাত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন জ্বরবিকাররোগে পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি একজন সুবিদ্বান্, সুলেখক ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইহাঁর অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকার্ত্ত হইয়াছি। ইহাঁর বৃদ্ধা জননী রোমীয় মাতা কর্ণিলীয়ার মত পুত্রগণের মহত্বের স্মৃতি লইয়া সান্ত্বনা লাভ করুন। জগদীশ পরলোকগত আত্মার

শাস্তি বিধান ও তাঁহার পরিত্যক্ত নিরাশ্রয় পরিবারের রক্ষার উপায় বিধান করুন।

ফর্ম্মোসার রূপান্তর—জাপান যুদ্ধ-জয়ী হইয়া চিনের নিকট হইতে ফর্ম্মোসা দ্বীপ পাইলেন। কিন্তু ফর্ম্মোসাবাসিগণ স্বদেশকে সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব চিন-শাসনকর্ত্তা টাং ইহার প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছেন।

ওমরা খাঁ—চিত্রলযুদ্ধের এক প্রধান অভিনেতা ওমরা খাঁ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কাবুলে পলাইয়া গিয়া আমীরের শরণাপন্ন হইয়াছেন। আমীর তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শরণাগত মুসলমানের প্রতি দয়া প্রকাশ করা মুসলমানের কর্ত্তব্য বলিয়া তাহাকে আশ্রয় দিতেছেন।

আমীরপুত্রের অভ্যর্থনা—প্রিন্স নসিরুল্লা ইংলণ্ডে গিয়া বাসের জন্য সুসজ্জিত প্রাসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মহারাণী, যুবরাজ ও রাজপরিবারদিগের দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত-বিনোদনার্থ নানাবিধ অনুষ্ঠান হইতেছে।

হেয়ার বার্ষিক উৎসব—গত ১লা জুন স্বর্গীয় হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে তাঁহার সমাধিস্তম্ভের নিকট তাঁহার কয়েকটী প্রাচীন ছাত্রসহ তাঁহার গুণানুরাগিগণ একত্র হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন ও তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ৫৩ বর্ষ হইল তিনি স্বর্গগত হইয়াছেন।

বৃদ্ধ-সেবা—বৃদ্ধসেবা ধর্ম্মলাভের প্রধান উপায় বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে কীর্ত্তিত। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্ ও সাম্রাজ্ঞীর এ সম্বন্ধে সদনুষ্ঠানের সংবাদ পাঠ করিয়া আমরা পরম সুখী হইলাম। একটী সুসজ্জিত উচ্চ আসনে মহাসমারোহ করিয়া এক দিকে ১২টী বৃদ্ধা মহিলা ও অপর দিকে ১২টী বৃদ্ধকে বসান হয়। ইঁহারা প্রাচীন দরিদ্র বংশ হইতে মনোনীত হন। এক দিকে সাম্রাজ্ঞী সহচরীদিগকে লইয়া বৃদ্ধা-দিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া স্বহস্তে তাঁহাদের পদধৌত করিয়া দেন, অন্য দিকে সম্রাট্ বৃদ্ধদের সেইরূপ সেবা করেন। খুব জনতা ও বাদ্যোদ্যমাদি হয়।

স্ত্রী-শিল্পী—পাঁচদোনা-নিবাসিনী শ্রীমতী অক্ষয়কুমারী গুপ্তা কাগজে ছবি কাটিয়া ও চিত্র করিয়া এরূপ শিল্পপারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন যে, তাহা দেখিয়া ইংরাজ-চক্ষুও মুগ্ধ হইয়াছে। ইনি সর্ব্বতো-ভাবে উৎসাহলাভের যোগ্যা।

সাময়িক পত্রিকা—দাসাশ্রমের পত্রিকা "দাসীর" বর্দ্ধিত আকার দর্শনে আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। ইহাতে বিবিধ উপাদেয় ও সারগর্ভ প্রবন্ধও লিখিত হইতেছে। সাধারণে বার্ষিক ২৲ টাকা দিয়া ইহার গ্রাহক হইলে পত্রিকার উন্নতি এবং দাসাশ্রমের সাধু কার্য্যের সহায়তা করা হয়।

নারী-চরিত।

মেরিয়া আগ্নেসি।

মেরিয়া গটানা আগ্নেসি ইটালিদেশীয় এক সুপ্রসিদ্ধ রমণী। ইনি বিজ্ঞানের উচ্চ তত্ত্ব সকল শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা বলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে মিলান নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার বয়স যখন ৯ বৎসর মাত্র, তখন লাটিন ভাষায় ইঁহার এ প্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে, তিনি ঐ ভাষায় এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রচার করেন এবং তাহাতে স্ত্রী-জাতির উদার শিক্ষার কর্ত্তব্যতা সমর্থন করেন। যখন তাঁহার বয়স ১৩ বৎসর, তখন তিনি গ্রীক, হিব্রু, ফরাসি, স্পেনীয়, জর্ম্মাণ, এবং আরও কতকগুলি ভাষায় সুপণ্ডিতা হন। এই জন্য লোকে তাঁহাকে "walking polyglot" সচল সর্ব্ব-ভাষা বলিয়া ডাকিত। দুই বৎসর পরে তাঁহার পিতা মধ্যে মধ্যে বলোনা নগরে পণ্ডিত-মণ্ডলীর সমিতি আহ্বান করিতেন। এই সকল পণ্ডিতের সমক্ষে—আগ্নেসি অতি উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব সকলের বিচার করিতেন। প্রেসিডেণ্ট ডিব্রসিস্ এইরূপ এক সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার রচিত একখানি পুস্তকে সেই সভার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে আগ্নেসির পিতা "Propositions Philosophicœ" দার্শনিক-তত্ত্ব নামে একখানি পুস্তক প্রচার করেন, তাহাতে কন্যার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মেরিয়া আগ্নেসি স্বভাবতঃ নম্রপ্রকৃতি ছিলেন। বিদ্যার এরূপ আড়ম্বরিতা তাঁহার ভাল লাগিত না এবং ২০ বৎসর বয়সের সময় তিনি সংসারের যশোবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিতে উৎসুক হন। তাঁহার বাসনা তখন পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু এই সময় হইতেই তিনি লোকসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বাস করেন। তিনি নির্জ্জনে গণিতশাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্তা হন। দুইখানি গণিত-পুস্তক এই নির্জ্জন বাসের ফল এবং তাহা ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মিলান নগরে প্রচারিত হয়। প্রথম ভাগে (Analysis of finite quantities) সসীম সংখ্যা ও দ্বিতীয় ভাগে (Analysis of infinitesimals) অসীম ভগ্নাংশের গূঢ়তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যাত আছে। যে সময়ে ইহা প্রচারিত হয়, তৎকালীন পণ্ডিতেরা ইহা দর্শন করিয়া চমৎকৃত হন এবং মুক্তকণ্ঠে গ্রন্থকর্ত্রীর প্রশংসা করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড ফরাসি ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত-অধ্যাপক কোলসন ইংরাজি ভাষায় দুইখানি পুস্তকই অনুবাদিত করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর এক ধনাঢ্য জমিদারের অর্থ-সাহায্যে

তাহা প্রচারিত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এডিনবর্গ রিভিউ পত্রিকায় ইহার যে সমালোচনা বাহির হয়, তাহাতে গ্রন্থকর্ত্রীর পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট প্রশংসা দেখা যায়। আগ্নেসি (Conic Sections) কোণবিভাগ-শাস্ত্রের এক টীকাগ্রন্থ লেখেন, তাহা মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই বটে, কিন্তু যাঁহারা তাহা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা পীড়াগ্রস্ত হইলে পোপ চতুর্দ্দশ বেনিডিক্ট পিতৃপদে ইহাকে বলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৭৫২ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়া আপনার বহু দিনের বাসনা পূর্ণ করেন। বহুদিনাবধি তাঁহার মনের আর একটী সাধ ছিল, তাহাও ক্রমে পূর্ণ হইল। মিলানে (Blue Nuns) নীল সন্ন্যাসিনীদিগের যে আশ্রম আছে, তিনি কিছু দিন তাহার অধ্যক্ষতার কার্য্য সম্পন্ন করেন। অবশেষে তিনি স্বয়ং সেই ভগিনীদলে প্রবিষ্ট হইয়া আশ্রমোচিত কৃচ্ছ্র ব্রত সাধনে নিযুক্ত হন এবং ১৭৯৯ সালে অশীতি বর্ষের বৃদ্ধা হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

সৃষ্টি প্রক্রিয়া রহস্য।

(৩৬২ সংখ্যা, ৩৩৮ পৃষ্ঠার পর)

সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ॥
—চণ্ডী ১অ, ৭২।

অনন্তর হরি সর্পশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দুরাত্মা মধু কৈটভ দৈত্যদ্বয়ের সহিত পঞ্চ সহস্র বৎসর অতি ঘোরতর মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই, নারায়ণ অর্থাৎ জলরাশি, দেবমানে পাঁচ হাজার বৎসর, মনুষ্যমানে ১৮,২৫০০০, বৎসর কীটযুক্ত হইয়াছিল। উক্ত পরিমাণ বৎসর পরে কীটপুঞ্জ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার জলজন্তু উৎপন্ন হইয়াছিল। জলজন্তু মধ্যে মৎস্যই প্রধান, এজন্য ভগবানের প্রথম অবতারকে মৎস্য অবতার বলে।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে মৎস্যো মনুঃ কালপ্রতিষ্ঠকঃ।
—মৎস্যপুরাণ।

যখন জলভাগ উত্তীর্ণ হইয়া স্থলভাগ দেখা দিল, তখন জল ও স্থল এই উভয় স্থানে বাস করিবার উপযুক্ত জন্তু সকল উৎপন্ন হইল। উহাদিগের মধ্যে কূর্ম্মই প্রধান, এজন্য কূর্ম্ম ভগবানের দ্বিতীয় অবতার।

কূর্ম্মরূপং সমাস্থায় দধ্রে বিষ্ণুশ্চ মন্দরম্।
—কূর্ম্মপুরাণ।

তাহার পর জলও নয় স্থলও নয়, অর্থাৎ কর্দ্দমযুক্ত স্থানের উপযুক্ত জীব সকল আবির্ভূত হইল। তন্মধ্যে বরাহই শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি, এজন্য উহা ভগবানের তৃতীয় অবতার।

দেবৈর্গত্বা স্তুতো বিষ্ণুর্বজ্ঞরূপো বরাহকঃ ॥
অভূৎ তং দানবং হত্বা দৈত্যোঃ সাকঞ্চ কণ্টকং।
—বরাহপুরাণ।

যখন ভগবান্ বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত অধিক। ঐ সময় পৃথিবী যেন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমশঃ এই উন্নতাবস্থা যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, অমনি তৎসঙ্গে সঙ্গে অশ্ব, গো মেষ, মহিষ ইত্যাদি শৃঙ্গী জন্তু সকল দেখা দিল।

"মহিষাসুরসেনানী চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ।
যুযুধে চামরৈশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ॥
—চণ্ডী, ২য় অধ্যায়, ৩৯।

পৃথিবীর এই অবস্থা লইয়া মহিষাসুরের সহিত প্রকৃতি দেবীর ভয়ানক যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনা যায়; অর্থাৎ পরিণামশীলা প্রকৃতি এই ভাবে পৃথিবীকে দর্শন করিতে লাগিলেন, যেন উদ্ভিদ্‌জীবী শৃঙ্গী পশুগণের বংশ এত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে যে, তাহাদিগের বিনাশ সাধন না করিলে সমস্ত পাদপরাজ্য নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং প্রকৃতি সিংহবাহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন।

তত্যাজ মহিষং রূপং সোঽপবিদ্ধো মহামৃধে।
ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবত্তস্যাম্বিকাশিরঃ॥
—চণ্ডী, ৩ অ, ২৮।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শৃঙ্গী জীবের পর সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সকল প্রকৃতির স্বভাবগুণে দেখা দিল। হিংস্র জন্তুরা স্বভাবতঃ গো, মেষ, মহিষ ইত্যাদি ভক্ষণে জীবন ধারণ করে, সুতরাং হিংস্র জন্তুদিগের দ্বারা শৃঙ্গী জীব সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তৎপরে পৃথিবী অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়া উঠিল। কিন্তু সম্যক্ প্রকারে উপযুক্ত না হওয়াতে ব্রহ্মার তৃতীয় সৃষ্টি দেখা দিল। উহাতে দানব কিন্নর ও অর্দ্ধ-নরাকৃতি জীব সকল উৎপন্ন হইল।

"অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুদ্ধমানো মহাসুরঃ।
—চণ্ডী, ৩ অ, ৩৯।

এই সময় ভগবান্ ভয়ানক নৃসিংহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

জিতদেবযজ্ঞভাগঃ সর্ব্বদেবাধিকারকৃৎ।
নারসিংহবপুঃ কৃত্বা তং জঘান সুরৈঃ সহ॥
—নারসিংহপুরাণ।

এই অবস্থার পর ভূমণ্ডল অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলে দেবাসুরের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে বনজঙ্গল নষ্ট হইয়া মনুষ্যের বাসযোগ্য স্থান সকল দৃষ্টিগোচর হইল। এরূপ অবস্থায় পদার্পণ করিতে ভূমণ্ডলের ছত্রিশ হাজার পাঁচ শত বৎসর লাগিয়াছিল, কারণ উক্ত পরিমাণ সময় দেবাসুরের যুদ্ধ হয়। যথা,—

"দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।"

অতএব দেবমানে একশত বৎসর, মনুষ্যমানে ৩৬,৫০০ বৎসর হয়।

এই সময়ে ব্রহ্মার চতুর্থ সৃষ্টি মনুষ্যবংশ উৎপন্ন হইয়া আপন আপন বাসস্থান স্থির করিতে লাগিল। দানবদল ঐ সময়ে রাজা হইয়া রাজ্য করিতে শিখিয়াছে। মনুবংশ তদ্দর্শনে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলে,

ভগবান্ মনুষ্যকুলে বামনরূপে অবতীর্ণ হইলেন।

"দেবাসুরে পুরা যুদ্ধে বলিপ্রভৃতিভিঃ সুরৈঃ।
ততোঽসৌ বামনো ভূত্বা হন্দিত্যাং স ক্রতুং যযৌ॥
—বামনপুরাণ।

ভগবান্ বামন অবতারে ত্রিবিক্রমরূপ মহাবিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যরাজ বলিকে ছলনাপূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করতঃ পাতালতলে প্রেরণ করিয়া মনুষ্যবংশের রাজত্ব সংস্থাপন করিলেন। যখন পৃথিবী অধিকতর উন্নতিশীল হইয়া উঠিল, তখন মনুষ্য সকল অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে শিখিয়াছে, ও নানাবিধ শিল্পকার্য্য উদ্ভাবন করিয়া আপনাদিগের সুখসম্ভোগ বৃদ্ধি করিয়াছে, রাজা হইয়া সুখ সম্ভোগ করিব এরূপ সকলেরই ইচ্ছা জন্মিয়াছে, সুতরাং এই সময়ে রাজ্যাধিকারলাভের জন্য ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া, ভগবান্ পরশুরাম-রূপে অবতীর্ণ হইলেন।

"বক্ষ্যে পরশুরামস্য চাবতারং শৃণু দ্বিজ।
উদ্ধতান্ ক্ষত্রিয়ান্ মত্বা ভূভারহরণায় সঃ॥
—অগ্নিপুরাণ, ৪ অ, ১২।

এই সময়ে শান্তিস্থাপনের জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী শ্রেণী সংস্থাপিত হইয়াছিল। পরশুরাম এক-বিংশ বার বিদ্রোহীদিগকে সমূলে উন্মূলিত করিয়াছিলেন। এই অবতারসময়ে মনুষ্যবংশ সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইয়াছিল। পরশুরামের অস্ত্র কুঠার, মনুষ্যগণ এই সময়ে যে মোটামুটি অস্ত্র সকল প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তদনন্তর পৃথিবী উহা অপেক্ষা উন্নতিশীল হইয়া উঠিলে ভগবান্ মনুষ্যদিগকে রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃ-শুশ্রূষা, স্ত্রৈণভাব নিবারণ, শত্রুদমন, ধর্ম্মোপদেশ ইত্যাদি আবশ্যক বিষয় সকল শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন রূপ চারি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"রাবণাদের্ব্বধার্থায় চতুর্দ্ধাভূৎ স্বয়ং হরিঃ।
রাজ্ঞো দশরথাদ্রামঃ কৌশল্যায়াং বভূব হ।
কৈকেয্যাং ভরতঃ পুত্রঃ সুমিত্রায়াঞ্চ লক্ষ্মণঃ।
শত্রুঘ্ন ঋষ্যশৃঙ্গেণ তাসু সন্দত্তপায়সাৎ॥
—অগ্নিপুরাণ।

এই সময় হইতে মনুষ্যগণের যথোচিত জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। (ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

শূল।

কর্পূর, সাজিমাটি এবং মরিচ যথা-পরিমাণ জল সহ সেবন করিলে অথবা যবানী (যোয়ান)॥০ তোলা ও লবণ।০ আনা চিবাইয়া খাইলে শূলবেদনার শান্তি হয়।

তেঁতুলছাল ভস্ম ১০ আনা পরিমাণ

শীতল জলে গুলিয়া সেবন করিলে সুদারুণ শূলবেদনা উপশমিত হয়।

জাঙ্গি হরিতকী এক ছটাক, সিদ্ধি এক ছটাক, বেলশুঁঠা অৰ্দ্ধ ছটাক, পাতি লেবুর শিকড় অৰ্দ্ধ ছটাক, যোয়ান এক কাঁচ্চা, এই কয়েকটী দ্রব্য এক সঙ্গে পেষণ করতঃ মটরের আকারে বটিকা প্রস্তুত করিবে। সেই বটিকা এক একটী দুই বেলা খাইলে অম্লশূল আরাম হয়।

কাঁচা হলুদ ভিজান জল এক ছটাক, বয়ড়া ভিজান জল অৰ্দ্ধ ছটাক, হরিতকী ভিজান জল অৰ্দ্ধ ছটাক, পাতি লেবুর রস এক ছটাক, এই কয়েকটী দ্রব্য এক-সঙ্গে মিলাইয়া এক কাঁচ্চা পরিমাণ প্রাতে ২।৩ ফোঁটা মধু মিশাইয়া খাইলে, বায়ুশূল ভাল হয়।

আমলকী বা ভূমি-কুষ্মাণ্ডের রস বলাডম্বুর ও কিস্‌মিসের কাথের সহিত চিনি যোগ করিয়া পান করিলে অল্প দিনের মধ্যে শূল নিবারিত হয়।

শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশমূল, গোক্ষুর, ইহাদের মিলিত দুই তোলা ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া, ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া পান করিলে, রক্তপিত্ত, দাহ, পৈত্তিকশূল, ও জ্বরাদি নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

শুঁঠচূর্ণ ৫ পাঁচ ভরি, বিটলবণ ২॥০ আড়াই ভরি, সোহাগা ১।০ সওয়া ভরি, মূলতানী হিং ॥৶ দশ আনা ওজনের পর খৈ করিয়া লইতে হয়।

সজনাগাছের ছালের রস দিয়া প্রথমে হিং মাড়িতে হয়, তৎপরে উহাতে বিট-লবণ মিশাইয়া মাড়িতে হয়, তৎপরে সোহাগার খৈ মিশাইয়া মাড়িতে হয়। অনন্তর শুঁঠচূর্ণ মিশাইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ৫৪ চুয়ান্নটী বড়ি বাঁধিতে হয়। সজনারসের পরিমাণের নিয়ম নাই। যত দিলে সমুদায় দ্রব্য উত্তমরূপে মাড়া ও বড়ী বাঁধা যায়, ততই দিতে হয়।

২৭ দিন প্রাতঃকালে এক বড়ী ও সায়ংকালে এক বড়ী মুখে ফেলিয়া জল দিয়া খাইতে হয়।

পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতপক্ব ব্যঞ্জন, দুগ্ধ। মৎস্য নিষিদ্ধ নহে; ঘৃত পাক করিয়া খাওয়া যাইতে পারে।

নিষিদ্ধ—শাক, অম্ল, মিষ্ট, তৈল, কাঁচা ঘৃত, ডাউল, ময়দা, পিষ্টক, ভাজা দ্রব্য, মাদক দ্রব্য, নূতন তণ্ডুল।

যে কয়েক দিন ঔষধ সেবন করিতে হয়, কেবল সেই কয়েক দিন পথ্যের নিয়মানুসারে চলিতে হয়।

হরিণের শৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া আবদ্ধ মৃণ্ময় পাত্রে ভস্ম করিবে, সেই ভস্ম ঘৃতের সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক অবলেহন করিলে অল্প দিনের মধ্যে হৃদয় ও নিতম্বদেশের শূলনি ভাল হয়।

প্রত্যূষে ২ তোলা রসুনের রসে কিঞ্চিৎ মধু যোগ করিয়া ৫।৭ দিন পান করিলে বাতশ্লৈষ্মিক শূল নিবারিত হয়।

(ক্রমশঃ)

ফ্রান্সে ভারতরাজকুমারী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কালস্রোতে ও জলস্রোতে কুমারী কিছু দূর ভাসিয়া গেল। পোত হইতে ইংরাজ নাবিকগণ দেখিতে পাইল যে, বহুমূল্য রত্নাদিতে বিভূষিতা একটী বালিকা ভাসিয়া যাইতেছে। তাহারা তৎক্ষণাৎ বোটে চড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া তাহাদিগের জাহাজে লইয়া গেল। জাহাজখানি তখন য়ুরোপে যাইতেছিল। ফরাসী রণপোত কর্ত্তৃক উহা ধৃত হয়। অবশিষ্ট লোকদিগের কি দশা ঘটিল, তাহা আমরা অবগত নহি, এইটুকু মাত্র জানি যে, রত্নবিভূষিতা বালিকাটি প্রাচ্য দেশের এক অতীব আশ্চর্য্য পদার্থবৎ সাম্রাজ্ঞী জোজেফাইনের নিকট আনীত হয়। তিনি ইহাঁকে দত্তক স্বরূপ গ্রহণ করেন। ভারত-পরিচ্ছদ-পরিহিতা ভারত-রাজকুমারী তাঁহার সন্নিধানে উপবিষ্টা থাকিয়া ছোট বড় সকলের দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় এত সুখে রহিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বদশার কিছুই স্মরণ রহিল না—নির্ব্বাসনের দুঃখ-মেঘ সুখ-রবিকে ঢাকিবে কি, একবারও চিদাকাশে দেখা দিল না। চিত্ত-বিনোদিনী সাম্রাজ্ঞীর চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল এইরূপে কাটিল না। জোজেফাইনের স্থান মেরী লুই গ্রহণ করাতে তাঁহার অবস্থান্তর ঘটিল। এরূপ ঘটাতে ভারত-রাজকুমারী ফরাসীদেশে যে 'পথের কাঙ্গালিনী' সেই কাঙ্গালিনী পুনরায় হইলেন। কাল-চক্রের এইরূপ গতি! অপিচ, কথায় বলে, "আপনার দেশের ঠাকুর, পরের দেশের কুকুর।" পরদেশে অতি সুখ সচ্ছন্দে ও বিক্রমশালী হইয়া থাকিলেও তথাপি তথাকার কুকুর অপেক্ষা বড় নহে। এ ত গেল ভাগ্যবানের কথা। যাহাদিগের অদৃষ্ট মন্দ, পরদেশে কুকুর অপেক্ষা তাহাদিগের দশা মন্দ। সে যাহা হউক চার্লস মার্সিয়ার নামে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ সর্ব্বদা রাজভবনে কার্য্যোপলক্ষে গমন করিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে বড় দয়া হইল। তিনি দুঃস্থা বালিকাকে আপনার মাতার সন্নিধানে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেন। তিনি প্রথমে সম্মত হন নাই। কিন্তু অবশেষে ভরণপোষণের উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি স্বীকার পাইতে বাধ্য হন। কথিত আছে, ইনি উহাঁর পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু রাজবালা প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহার পদবী ও নাম গ্রহণ করেন নাই। আবার দেখুন, অনেক উপন্যাসলেখক তাঁহার চরিত্র অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব উপন্যাসের প্রবর্ত্তনা করাতে অনেকে এই মনে করেন যে, তিনি আদৌ সাম্রাজ্ঞীর প্রসাদলাভে সমর্থ হন নাই। অন্য পক্ষের এইরূপ বিশ্বাস

যে, মহাবীর বোনাপার্টি যখন মিসরদেশে গমন করেন, তখন জোজেফাইন ইহাঁকে দত্তকস্বরূপ গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি এ দেশে আগমন করিয়া 'যাঁহার কন্যা তাঁহাকে দিবেন' এইরূপ অভিলাষ করেন; কিন্তু কুমারী নিজে ইচ্ছা করিয়া তৎসময়ের সমরানলে সভ্য জগৎকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন নাই। যদ্যপি কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া কিছু লিখিতে হয়, তাহা হইলে আমরা ইহাও লিখিতে বাধ্য যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যাবজ্জীবন তাঁহাকে ৫০ পাউণ্ড করিয়া বার্ষিক পেনসন্ দেন। অপর কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত বার্ষিক তাঁহাকে কোম্পানী দিতেন না, ডাইরেক্টরদিগের মধ্যে কেহ কেহ দিতেন।

ইনি সাহিত্যসংসারে কথঞ্চিৎ পরিচিতা ছিলেন। ইনি বোধ হয় ফরাসী ভাষায় অনেক প্রবন্ধাদি রচনা করেন। মার্সিয়ারকে সেইগুলি পড়িয়া বলিতেন তিনি ভাল করিয়া সেইগুলি লিপিবদ্ধ করেন। প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক থ্যাকারে ও তাঁহার বিপিতা অর্থাৎ বিধবা মাতার পতি মেজর স্মিথ তাঁহাকে অনেক আর্থিক সাহায্য করেন। মার্সিয়ারের মৃত্যুর পর তিনি কাউণ্টেস ডিবকোটের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ ক্ষেপণ করেন। কোন্ বৎসর ইহাঁর মৃত্যু হয়, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তবে এতটা ঠিক্ যে, তিনি ইংরাজী ১৮৫০ সাল পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদিগের দেশে কেহই ইহাঁর বিষয় জানেন না। তৎসময়ের হিন্দি বা উর্দ্দু কোনও পুস্তকে বা পত্রিকায় উল্লেখ আছে কি না জানি না, বোধ হয় নাই; থাকিলে কোনও না কোনও প্রকারে প্রকাশিত হইত। ইনি যে এক কাল্পনিক চরিত্র, তাহা নহে। ইহাঁর সম্বন্ধে উপরে যে বিবরণ প্রকটিত হইল, তাহাও অলীক নহে। এমন এক আশ্চর্য্য ঘটনা, এমন এক আশ্চর্য্যতর চরিত্র, আর এমন আশ্চর্য্যতম স্নেহ ও আশ্রয়দান যে কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়া একবারে বিলীন হইল, ইহার উপর ভারতের জ্ঞানালোক যে আদৌ নিপতিত হইল না, ইহা যে কতদূর আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা লিখিয়া কি জানাইব!

গ্রীক পুরাণ।

প্রাচীন হিন্দুদিগের ন্যায় মিসর, কাল্ডিয়া ও গ্রীশবাসিগণও সৃষ্টিপ্রকরণ ও পৌরাণিক দেবদেবীগণের অদ্ভুত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে ইহাঁদিগের পরস্পরের বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে এত সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে,

এক মূলজাতি হইতে এক আদি পুরাণ সৃষ্ট হইয়া অন্যান্য জাতির মধ্যে তাহাই নানা আকারে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। এ স্থলে আমরা গ্রীক পুরাণের স্থূল বিবরণ পাঠক পাঠিকাদিগের গোচর করিতেছি।

গ্রীকদিগের বর্ণনানুসারে সর্ব্বাগ্রে "chaos" অসৃষ্টি নামে এক দেবতা ছিলেন। তিনি অতি বৃহৎ ও আকৃতিবিহীন। তাঁহা হইতে গা (পৃথিবী) এবং টার্টেরস (নরক) উৎপন্ন হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভসময়েই ইরস (কাম) আবির্ভূত হইলেন ; ইনি দেব ও মানবের জয়কারী। কেয়স হইতে এরিবস (অন্ধকার) ও নিক্স (নিশা) জন্ম গ্রহণ করে। গা আউরেনস্ বা স্বর্গের এবং পণ্টস্ বা লবণ সমুদ্রের জননী। স্বর্গ তাঁহার অপেক্ষা উচ্চতর হইল। পরে তিনি স্বর্গকে বিবাহ করিলেন এবং এই বিবাহের ফল-স্বরূপ ছয়টী দৈত্য উৎপন্ন হইল—ওসেনস, কইয়স, ক্রিয়স, হাইপিরিয়ণ, আয়াপিটস্ ও ক্রণস্ (শনি)। ছয়টী দানবীও উৎপন্ন হইল, তাহাদের নাম থিয়া, রিয়া, থেমিস্, নিমোসিনি, ফিবি ও টেথিস্। তিনটী সাইক্লোপিস (একচক্ষু দানব) জন্মিল :—বাল্‌টিস, ষ্টিরোপিস ও আর্জিস। তিনটী শত-বাহু অসুরও জন্মিল :—কটস, ব্রায়ারিয়স্, ও গাইজিস। ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি দর্শনে ভীত হইয়া আউরেনস্ সন্তানগণকে ভূগর্ভে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। শনি স্বীয় মাতা কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া পিতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আউরেনসের হস্তপদ ছিন্ন হইয়া যে রক্তপাত হইল, তাহা হইতে ফিউরিস বা রাক্ষসী, জায়াণ্ট বা দৈত্য এবং মিলিয়ান্ নিম্ফ বা পরী উৎপন্ন হইল। কতক রক্ত সমুদ্রে পড়িয়া আফ্রোডিটিস বা রতির জন্ম হইল। শনি ও তাঁহার সহচর দৈত্যেরা এখন জগতের একাধিপত্য লাভ করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে বিবাহ করিয়া অসংখ্য সন্তান উৎপাদন করিলেন। ইহাঁদের ভগিনীরাই ইহাঁদের ভার্য্যা হইলেন। ওসেনস ও তাঁহার স্ত্রী টেথিস হইতে ৩০০০ পুত্র ও ৩০০ কন্যা উদ্ভূত হইল। হাইপিরিয়ান্ ও থিয়া হইতে হিলিয়স্ (সূর্য্য), সেলিনি (চন্দ্র), ও ইয়োস্ (ঊষা) জন্মিল। কায়স ও তাহার স্ত্রী ফিবি হইতে লেটোনা ও আষ্ট্রিয়া উৎপন্ন হইল। কায়স্ আষ্ট্রিয়াস, পালাস ও পার্সিসের পিতা। আষ্ট্রিয়াস ঊষার সহিত পরিণীত হইয়া জেফিরস, বেরিয়াস ও নোটস এই তিন বায়ুর জন্মদান করিল। পালাস ওসেনসের কন্যা ষ্টিক্সের সহিত বিবাহিত হইয়া জেলস (গৌরব), নাইকী (জয়), ক্রেটস (বল) এবং বিয়া (শক্তি), এই কয় সন্তান উৎপাদন করিল। আয়েপিটস ওসেনসের অন্যতম কন্যা ক্লেমনীর পাণিগ্রহণ করিয়া প্রমিথিয়স্, এপিমেথিয়াস, মিনিয়াস এবং আটলাসের জন্মদাতা হইলেন। এই সকল বিবাহোৎপন্ন সন্তানেরা আবার পরস্পরের মধ্যে বিবাহ করিয়া অগণ্য দেবদেবী উৎপন্ন করিলেন। বৃদ্ধা গার উৎপাদিকা শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই।

তাঁহার স্বামী আউরেনসের ঘোর দুর্গতির পর তিনি পন্টস্‌কে স্বামিরূপে বরণ করিয়া নীরিয়স্, দামস, ফর্কিস ও কিটোর জননী হইলেন। নীরিয়স হইতে নীরিদ বা অপ্সরা সকল, দামস্ হইতে আইরিস ও হার্পীদ্বয় এবং ফর্কিস ও কিটো হইতে গার্গণ, গ্রেই এবং হিস্‌পিরাইডিসের ড্রেগণ বা পক্ষযুক্ত সর্প উৎপন্ন হইল, ইহাদের হইতে আবার কত বংশ জন্মগ্রহণ করিল। ইতিমধ্যে নিশা অবিবাহিতা থাকিয়াও অসংখ্য সন্তানের জননী হইল, তাহাদের নাম থানেটাস (মৃত্যু), হিপ্নস (নিদ্রা), ওরিয়স (স্বপ্ন); মোমস (হাস্ত), অইজিস (শোক); তিন অদৃষ্টদেবী ক্লথো, লাকিসিস এবং আট্রোপস, বৈরঘাতিনী নিমিসিস্; আপেট (প্রবঞ্চনা); ফাইলোটস (প্রণয়); জিরাস (জরা) এবং এরিস (বিবাদ)। বিবাদ হইতে পনস (বেদনা), লেথি (ভ্রান্তি), লিমস (দুর্ভিক্ষ), ফনস (হত্যা), ম্যাচ (যুদ্ধ), ডিসনোমিয়া (অবৈধতা), এট (স্বৈর-প্রবৃত্তি) এবং ইর্কস (শপথসমর্থক) দেবতা। পৌরাণিক দেবতাদিগের মধ্যে আরও কতকগুলির নাম উল্লেখযোগ্য:—ক্রাইসেয়র, এবং পেগেসস্ অশ্ব মেডুসা নামক গর্গণের রক্ত হইতে উদ্ভূত; জারিয়ন্ এবং অর্দ্ধাপ্সরা অর্দ্ধসর্পাকৃতি এচিড্‌নার পিতা ক্রাইসেয়র, মাতা একটী সমুদ্র-পরী। দ্বিশীর্ষ কুক্কুর অরথ্রোস, পঞ্চাশৎ-শীর্ষ সারবিরস এবং লার্ণিয়া দেশীয় হাইড্রা বা শতশীর্ষ সর্প—ইহারা সকলেই এচিড্‌নার গর্ভজাত। হাইড্রা হইতে কিমারা, থিবস্ নগরের স্ফিংস এবং নিমিয়া দেশীয় সিংহ উৎপন্ন।

(ক্রমশঃ)

বিদেশবাসিনীর পত্র।

আজি এ দেশের জলাশয়ের কথা কিছু বলিব। এখানে পুকুর, নদী ও ঝরণা আছে। মনে হয়, স্বর্গীয় প্রমদা বাবু "ঝিলে"র উল্লেখও করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার বর্ণিত শত শত পদ্মফুলপূর্ণ "পদ্ম ঝিল" দেখিতে বড়ই উৎসুক হইয়াছিলাম। কিন্তু শুনিলাম, তাহা শীতকালে শুকাইয়া গিয়া থাকে। সেই জন্য সে "ঝিল" দেখার সাধ আমার পূর্ণ হয় নাই।

এখানে পুকুরকে "বাঁধ" বলে। আমি এখানকার দুইটী মাত্র "বাঁধ" দেখিয়াছি। তাহা এখানকার রাজার। পুকুর দুইটী বেশ বড় বড়; পরস্পরের কাছাকাছি। ইহাদের একটী পুরুষদিগের, অপরটী স্ত্রীলোক-দিগের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। বোধ হয় জলও বেশ ভাল ছিল; এখন পশুদিগের স্নান ও ধোপাদিগের ব্যবহারের জন্য জল খারাপ হইয়া গিয়াছে। তথাপি "দেশীয় রাজার কীর্ত্তি" বলিয়া তাহাই দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

পাহাড় হইতে যেসকল ঝরণা নামিয়াছে, তাহাতেই এ দেশের সাধারণ লোকদিগের অনেক প্রয়োজন সাধিত হয়। এই সকল ঝরণা স্রোত বহিয়া বহুদূর গিয়াছে; স্রোতগুলি ফল্গু নদীর জাতীয়া—অন্তঃসলিল। উপরে বালির জমাট; তাহাতে মানুষ, গরু, মহিষ প্রভৃতি অবাধে যাতায়াত করিতেছে; আবার সেই বালি খুঁড়িয়া ফেলিলে স্বচ্ছ, সুস্বাদু জল পাওয়া যায়।

এ দেশের নদী সকল, আমাদের দেশের নদীর মত প্রশস্তা বা নিত্য জোয়ার-ভাটা-সঙ্কুলা নহে। এখানে নদী সকল গ্রীষ্মকালে প্রায়ই শুকাইয়া যায়; কিন্তু বর্ষাকালে যেমন জলপূর্ণ, তেমনি খরস্রোতা হয়। সে স্রোতোবেগের মুখে পড়িলে মানব বা অন্যান্য জন্তুর রক্ষা পাওয়া দুঃসাধ্য। আমরা শুনিয়াছি, বর্ষাকালেও যখন বৃষ্টি না হয়, তখন এ সকল নদীর স্রোতঃ তত প্রখর হয় না, অভ্যস্ত মানুষে সাঁতার দিয়া এপার হইতে ওপারে যাইতে পারে। কিন্তু এক পসলা বৃষ্টি হইলেই এত প্রবল বেগ হয় যে, সত্য সত্যই "কুটা" দিলে "দুটা" হইয়া থাকে—সেই সময়ে অনভিজ্ঞ লোকে সাঁতার দিয়া পরপারে যাইতে একেবারে "ভবসিন্ধু" পার হইয়া যায়।*

আমি এ দেশের তিনটী নদী দেখিয়াছি। প্রথম উস্ত্রী নদী, দ্বিতীয় খাগো নদী, তৃতীয় শ্লেট নদী। ইহাদের মধ্যে উস্ত্রী অপেক্ষাকৃত প্রশস্তা। উস্ত্রীর দুই পাশে শ্যামল শালবন। স্তরে স্তরে প্রস্তরশ্রেণী সুসজ্জিত হইয়া "বাঁধা ঘাট" করিয়া আছে! সে দৃশ্য এত সুন্দর যে, প্রথমে ইহা দেখিয়া আমাদের কাহারও মনে হইয়াছিল যে, ইহা মানুষের হস্তপ্রস্তুত—কোনও নিপুণ শিল্পী কর্তৃক এই সুন্দর, অপূর্ব্ব, প্রস্তরময় ঘাট বাঁধান হইয়াছে। কিন্তু সে ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গিল; শীঘ্রই আমরা বুঝিলাম, এ শিল্পনৈপুণ্য মনুষ্যশিল্পীর নহে—অনন্ত সুন্দর সৃষ্টির স্রষ্টা সেই বিশ্বশিল্পীরই! তখন আমি মনে মনে বড়ই লজ্জিত, বড়ই অনুতপ্ত হইলাম। আমার মনে হইল, বিশ্বজগতের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য যাঁহার রচিত, এই সুন্দর পাথরের ঘাট করা তাঁহার পক্ষে আর কতটুকু? কিন্তু আমরা এতই সংশয়াপন্ন মূর্খ যে, তাঁহার অপেক্ষা, তাঁহার সৃষ্ট মানবের বুদ্ধি ক্ষমতা লইয়াই দিশাহারা হইয়া পড়ি! ছি! ছি! ছি!

আমরা সেই প্রস্তরাসনে বসিয়া উস্ত্রী নদীর স-লীল তরঙ্গ সকল দেখিতে লাগিলাম। সেই কবিজের ধ্বনি, সেই বিহঙ্গনিনাদিত স্নিগ্ধ শালবন মধ্যে, সেই সুন্দর স্রোতস্বিনীর রমণীয় প্রস্তরনির্ম্মিত তটে বসিয়া যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা এ জীবনে ভুলিবার নহে; অথচ ভাষায় প্রকাশ করিবারও নহে।

আমরা যখন দেখিলাম, তখন উস্ত্রীর

* মাইকেল দত্তের জীবনচরিতলেখক শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু এই রকম একটী শোচনীয় সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া "অভাগিনী" শীর্ষক কবিতা "দাসী" পত্রিকায় লিখিয়াছেন।

শুষ্কাবস্থা। সেই জন্য মানুষ, গরু প্রভৃতি হাঁটিয়া পরপারে যাইতেছে, দেখিতে পাইলাম। উস্ত্রীর পরপারে যাইবার সুখ-ভোগ করিতে আমরাও "উদাসীন" ছিলাম না; ইহার ভিতরকার বালি সকল এমন আলগা যে, এক স্থানে পাদক্ষেপ করিলে অন্য স্থানে সরিয়া পড়িতে হয়!

থাগোকে এখানে নদী নামে অভিহিত করিলেও প্রকৃতপক্ষে থাগো একটী অনতি-বৃহৎ ঝরণা। ইহার দুইধারে স্তম্ভাকৃতি প্রস্তর সকল বহুদূর ব্যাপিয়া রহিয়াছে; এই প্রস্তর-প্রাচীরের ভিতর দিয়া, মধুর গীতি গাহিতে গাহিতে সেই দিগন্তবাহিনী দিগন্ত-পথে ছুটিয়াছে! স্থানে স্থানে, উচ্চ স্তম্ভের উপর হইতে প্রবাহিত জলরাশির উপরে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া, দ্রবীভূত রামধনুর মত সুন্দর দেখাইতেছে। আহা, সে সৌন্দর্য্য কি অনির্ব্বচনীয়!

থাগোর এক প্রধান "বিশেষত্ব" এই যে, এখানে বিচিত্র বর্ণের পাথরের নুড়ি এবং অপেক্ষাকৃত বড় বড় পাথর দেখিতে পাওয়া যায়। সে সব এত সুন্দর যে, দেখিলে কেবল দুই হাতে কুড়াইতে ইচ্ছা করে—দুই হাতে কুড়াইয়াও সাধ মিটে না। ইহার মধ্যে সাদা রঙের পাথরগুলি চকমকি পাথরজাতীয়। রাত্রে (বাসায়) ইহার ঘর্ষণে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে দেখিয়া আমার ছোট ছোট ভাই ভগিনীরা বড়ই সুখী হইয়াছিল—আমিও খুব সুখী হইয়া-ছিলাম। থাগোর সুখ-স্মৃতিবৎ আমরা সেই হ্র একটী ছোট নুড়িও সযত্নে রক্ষা করিয়াছি।

এখানকার আর এক অপরূপ দৃশ্য শ্লেট নদী। বহুদিন আগে স্বর্গীয় প্রমদা বাবুর "সখায়" লিখিত প্রবন্ধ হইতে আমি প্রথমে শ্লেট নদীর কথা জানিতে পারিয়া-ছিলাম, আর এত দিনের পরে ভগবানের কৃপায় সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম। তাই, প্রবাসবাসে পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলে যেমন আনন্দ হয়, শ্লেট নদী দেখিয়া আমার তেমনি আনন্দ হইল!—সেই সঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রমদা বাবুর কথাও মনে আসিল।

শ্লেট নদী নির্জ্জন-প্রান্তরবাহিনী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী; ইহার দুই ধারে শ্লেট পাথরের শ্রেণী, কোথাও ক্ষুদ্র প্রাচীর, কোথাও সোপান, কোথাও স্তম্ভের আকারে শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভের গাত্র হইতে ঝর্ ঝর্ রবে জল প্রবাহ নিম্নে পতিত হইতেছে, সে যেন দ্রবীভূত কাচের ঝাড় বহিয়া যাইতেছে। ইহার এক একটী প্রাচীর, সোপান, স্তম্ভ প্রভৃতি এত পরিচ্ছন্ন যে, দেখিলে বোধ হয়, কেহ এ সকল মাজিয়া ঘষিয়া, সুন্দররূপে বসাইয়া রাখিয়াছে।

শ্লেট নদী বহুদূরব্যাপিনী। অন্যান্য নদীর অভ্যন্তরের মত ইহার ভিতরে কেবল বালি নহে, শ্লেট পাথর দিয়া ইহার মধ্য-ভাগ যেন বাঁধান রহিয়াছে। সেই জন্য ইহার ভিতরে হাঁটিয়া বেড়াইতে বড়ই সুখ। আমরা শুনিয়াছিলাম, আর কিছুদূর গেলে শ্লেট নদীর উৎপত্তি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিয়া, আমরা সে সাধ পূর্ণ করিবার

জন্য, শ্লেট নদীর সুন্দর স্রোতে, দুই ধারে শ্লেট পাথরের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, শ্লেট পাথরের উপর দিয়া, বহুদূরে যাইতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম; কিন্তু আমাদের সে সাধ পূর্ণ হয় নাই, কারণ আমাদের অভিভাবক মহাশয় শুনিয়াছিলেন যে, সেখানে নবজাত ব্যাঘ্রশিশু এবং তাহাদিগের "স্নেহময়ী" জননী বাস করিয়া থাকেন। আমাদিগকে সেখানে পাইলে, তাঁহারা যথোচিত "অতিথি-সৎকার" না করিয়া ছাড়িয়া দিবেন না, এ কথা শুনিয়া আর সে দিকে যাইতে আমাদের সাহস হইল না। গেলেও বোধ হয় প্রিয় ভগ্নী বামাবোধিনী-পাঠিকাদিগকে, এখানকার সংবাদ—যাহা আমি লিখিতেছি, তাহা আর লিখিতে পারিতাম না।

তখন, শ্লেট পাথরের নদীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ সময়ে, আমরা এক টুকরা শ্লেট পাথর লইয়া কয়েকটী স্তম্ভের উপরে বড় বড় অক্ষরে "ধন্য তুমি দয়াময়" লিখিলাম; তার পর ছোট ছোট অক্ষরে নিজের নাম, এবং আমার যে সকল ভক্তি, প্রীতি, ও স্নেহভাজনদিগের কথা, সেখানে গিয়া আমার মনে হইতেছিল, তাঁহাদের নামও লিখিলাম; বনদেবীর স্নেহধারারূপিণী শ্লেট নদীর বক্ষে আমাদের সেই লেখাগুলি প্রীতিচিহ্নস্বরূপ জাগিতেছিল। এত দিনে আমাদের সে প্রীতিচিহ্ন হয় তো মুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রিয় জনের স্মৃতির মত শ্লেট নদীর সে মনোমোহিনী ছটা আমাদের হৃদয়ে নীরবে নীরবে বহিয়া যাইতেছে! এমন সুন্দর, এমন মনোহর শোভারাশির রচয়িত্রী মা, বিশ্বজননি! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার! তুমি কোথায় কি অপূর্ব্ব বস্তু রাখিয়াছ, অধম আমি, কিছুই জানিতে পাইলাম না, তবে তোমার কৃপায় এত টুকু যে দেখিতে পাইলাম, ইহাতে কৃতার্থ হইয়াছি। (ক্রমশঃ)

ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

বায়ুশূন্য স্থানে কোন বস্তু রাখিয়া যদি তাহাতে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ আঘাতের শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। মনে কর, একটী বায়ু-নিকাসন যন্ত্রের স্থূল কাচের পাত্রটী একটী লৌহফলকের উপরে অধোমুখে বসান আছে। ঐ পাত্রটীর মুখ এরূপ সমতলভাবে নির্ম্মিত, যে ইহাকে অধোমুখে ঐ লৌহফলকে বসাইলে কিছুমাত্র ফাঁক থাকে না; সুতরাং ভিতরের বাতাস বাহিরে আসিতে পারে না, অথবা বাহিরের বাতাস ভিতরে যাইতে পারে না। ঐ ফলকের মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্রের সহিত এরূপ একটী কলের যোগ আছে, যদ্দ্বারা ঐ পাত্রমধ্যস্থ বায়ু আকর্ষণ করিয়া লওয়া যায়। ঘটিকা যন্ত্রের যে অংশ বাজিয়া থাকে, সেই অংশ

উক্ত পাত্রের মধ্যে দুইটী দণ্ডের উপর রজ্জু দ্বারা ঝুলান আছে। পাত্রের মধ্যস্থলে দণ্ডটী এইরূপে মানান আছে যে, উহা টানিয়া তুলিলে বা চাপিয়া নামাইলে ভিতরে বাতাস যাইতে পারে না; এবং চাপিয়া নামাইলে উহা ঐ ঘটিকা যন্ত্রের এরূপ স্থান স্পর্শ করে যে, ঐ ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। পাত্রস্থ বায়ু নিকাসন করিয়া দণ্ড চাপিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঐ ঘণ্টায় আঘাত হইতেছে, কিন্তু ঘণ্টার শব্দ কিছুমাত্র শ্রবণগোচর হইবে না। আবার যদি পাত্র বায়ুপূর্ণ করা যায় এবং উক্ত দণ্ড চাপিয়া আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ ঘণ্টাধ্বনি স্পষ্ট শ্রবণগোচর হইবে।

আবার যদি পাত্র নির্ব্বায়ু করিয়া ঘণ্টায় আঘাত করা যায় এবং একটী ধাতু-নির্ম্মিত তার ঐ ঘণ্টায় ছোঁয়াইয়া বাহিরে বায়ুর সহিত মিলিত করা যায়, তাহা হইলে ঐ ঘণ্টা-ধ্বনি স্পষ্ট শ্রবণগোচর হইবে। এখানে ঐ ধাতুনির্ম্মিত তার আশ্রয় করিয়া ঘণ্টাপ্রকম্প বায়ুতে প্রসারিত হয় বলিয়া ঐ শব্দ শোনা যায়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ধ্বনি তরঙ্গ আশ্রয় ভিন্ন প্রসারিত হইতে পারে না।

বায়ু-নিকাসন যন্ত্রের দ্বারা আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাত্র সম্যক্ বায়ু-পূর্ণ থাকিলেও তন্মধ্যস্থ ঘণ্টার ধ্বনি অতিশয় মৃদু শোনা যায়। কিন্তু ঐ পাত্র অন্তরিত করিয়া অনাবৃত স্থানে সেই ধ্বনি করিলে, উহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উচ্চ উপলব্ধ হইবে। প্রথমোক্ত স্থলে ঘণ্টাধ্বনি অর্থাৎ ঘণ্টার প্রকম্প বেগ মধ্যস্থিত বায়ুতে প্রসারিত হইয়া পাত্রে সংক্রামিত হইবে এবং ঐ পাত্র হইতে বাহিরের বায়ুতে প্রসারিত হইবে। সুতরাং অনায়াসে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ধ্বনি-প্রবাহ লঘু বস্তু হইতে গুরু বস্তুতে প্রসারিত হইলে, ধ্বনি-প্রবাহের বেগ কমিয়া যায়। এই নিমিত্ত যদি কেহ জলমগ্ন থাকে, এবং অপর এক ব্যক্তি উপরে থাকিয়া কথা কহে, তবে ঐ জলমগ্ন ব্যক্তি ঐ কথা তাদৃশ শুনিতে পাইবে না।

ফলতঃ অন্যান্য বেগ যে যে নিয়মের অধীন হইয়া চলিয়া থাকে, ধ্বনিপ্রবাহকেও সেই সেই নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হয়। বেগমাত্রেই লঘু বস্তু হইতে গুরু বস্তুতে প্রসারিত হইলে হীনবল হইয়া থাকে, সুতরাং ধ্বনিপ্রবাহেরও ঐরূপ ঘটিবে। বেগমাত্রই যত দূরে প্রসারিত হয়, ততই তাহার হ্রাস হইতে থাকে; ধ্বনি-প্রবাহও যত দূরে প্রসারিত হয়, ততই উহার হ্রাস হইয়া থাকে। যেমন কোন বিস্তীর্ণ জলাশয়ে একটি গুরু লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, নিক্ষিপ্ত স্থানে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইবে, কিন্তু ঐ তরঙ্গ যত বিস্তৃত হইতে থাকে, ততই উহার প্রবলতার হ্রাস হইতে থাকে—ক্রমশঃই উহা অল্প ও মৃদু হইয়া পড়ে। ইহার কারণ অনায়াসে উপলব্ধ হইতে পারে। (ক্রমশঃ)